চাকমা পুরাণ

সারোয়ার হাসান

লোক-কৃষ্টি সিরিজ # ১

চাকমা পুরাণ

সারোয়ার হাসান

কুহক

কল্পনার শুরু এখানেই

CamScanner

প্রকাশক,
ইসমাত জারিন
কুহক কমিক্স এন্ড পাবলিকেশন
মুঠোফোন: 01624650450, 01944243969
ইমেইল: submit.kuhok@gmail.com

প্রকাশকাল: বইমেলা ২০২৩

স্বত্ব: লেখক

প্রচ্ছদ: তাওহীদ আহমেদ
বর্ণ বিন্যাস: তাওসীফ আহমেদ
বানান শুদ্ধি: মালিহা নামলাহ
মুদ্রিত মুল্য: ৩৯০ টাকা

মুদ্রণ: প্যাসিফিক প্রিন্টার্স
অনলাইন পরিবেশক: রকমারি, ধী, প্রজ্ঞা

Chakma Puran by Sarowar Hasan
Published by Kuhok Comics And Publication
38 Banglabazar, Dhaka
Price: 390 Taka
10 USD

(প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনও অংশ কপি, মুদ্রণ করা, ই-বুক আকারে বের করা, আইনত দন্ডনীয় অপরাধ)

উৎসর্গপত্র

২০১৯ সালের ঈদ উল ফিতরের পরের ঘটনা। তখন কয়েকটা টিউশনি করতাম। তাই লেখাপড়ার চাপ আর টিউশনির কারণে বেশ কিছু দিন নানুর বাড়ি যাওয়া হয়নি। তো ঈদের পরে আব্বু আম্মুর জোরাজুরিতে গেলাম নানুর বাসায়। দুই তিন দিন থেকে যখন বাড়ি ফিরব তখন দেখলাম নানা একটা ফতুয়া আর নতুন লুঙ্গি পড়ে উঠোনের এক কোনায় চেয়ারের মাঝে বসে আছেন। বিদায় নেয়ার জন্য নানার কাছে গেলাম। নানা হাসিমুখে আমার হাতে একশো টাকার একটা নোট গুজে দিলেন। তাসনীমকে দিলেন পঞ্চাশ টাকার একটা নোট। তা-ই দেখে পিছন থেকে আম্মু বলল, "আব্বা ওকে টাকা দিচ্ছেন কেন? ও নিজেই এখন ইনকাম করে। টিউশনি করায়।" প্রত্যুত্তরে নানা হাসিমুখে জবাব দিলেন, "ওর এই অল্প টেকাতে হইব না। ও বড় হইয়া অনেক টেকা ইনকাম করব। তহন আমারে অনেক বড় ডাক্তরের কাছে নিয়ে যাইব।" সেদিন আমি শুধু মুচকি হেসেছিলাম, কিন্তু কিছু বলিনি। এর ১০-১২ দিন পরেই এক দুপুরে খবর আসলো নানা মারা গেছেন। আমার ভিতরটা ধক করে উঠলো। চারিপাশ এক অজানা শূন্যতায় ছেয়ে গেলো। কানে বাজতে লাগলো একটাই কথা "ও বড় হইয়া অনেক টেকা ইনকাম করব। তহন আমারে অনেক বড় ডাক্তরের কাছে নিয়ে যাইব।"

নানাকে মুখ ফুটে কখনো বলা হয়নি, "নানা তোমাকে বড্ড ভালোবাসি।" আমার প্রথম বইটার উৎসর্গপত্র নানার জন্য! এবং যারা না থাকলে আমি এই পৃথিবীর আলো দেখতাম না, এই বইটাও লিখতে পারতাম না, আমার আমার আম্মু-আব্বুকেও এই বইটা উৎসর্গ করছি।

অফেলিয়া চাকমাকে, যার সাহায্য ছাড়া এই লেখাগুলো লিপিব হতো না।

CamScanner

ভূমিকা

মিথ ফিকশন না-কি নন ফিকশন তা নিয়ে আমি বরাবরই সন্দিহান। আপাত দৃষ্টিতে পৌরাণিক কাহিনী কিংবা মিথ গাল-গল্প মনে হলেও এটাই একটা জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস। অর্থাৎ সরাসরি ফিকশন বলার সুযোগ নেই, আবার এমন অলীক গল্পকে অকপটে নন ফিকশনও বলা যায় না। মিথ ফিকশন হোক আর নন ফিকশন হোক, ফ্যান্টাসির পর এটাই আমার পছন্দের বিষয়। আর পছন্দের বিষয় নিয়ে কাজ করতে সবাই ভালোবাসে। আমার লেখালেখির হাতেখড়ি মিথলজিক্যাল ফ্যান্টাসি দিয়েই, আমার শুরু করা প্রথম পাণ্ডুলিপি "মৃত্যুপুঁথি - মহাপ্রলয়ের আখ্যান"।

মৃত্যুপুঁথি প্রকাশ পাবার কথা আরো তিন বছর পূর্বে, কিন্তু দুর্মূল্যের এই বাজারে অপরিচিত একটা জনরার বই আনার সাহস আমার হয়নি(এখন অবশ্য ফ্যান্টাসি নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে, মানুষও ভালো সাড়া দিচ্ছে)। তখন-ই আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই তাওসীফ আহমেদ পরামর্শ দেন মিথলজি নিয়ে কাজ করার জন্য। এই মানুষটার কাছে আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ। লেখালেখির এই জগতটার সাথে পরিচয় করিয়েছেন তিনি। যেকোন সমস্যায় আমাকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট দিয়েছেন এই মানুষটাই। আমি বরাবরই একটু অলস প্রকৃতির, তাই চাকমা মিথলজি শুরু করার পর সপ্তাহে অন্তত একবার পাণ্ডুলিপির খোঁজ নিতেন ভাইয়া। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ আমার প্রকাশিকা ইসমাত আপুর কাছে। লেখালেখির জগতে এসে সবচেয়ে বেশি বকা খেয়েছি আপুর কাছেই, কিন্তু সেই বকার মধ্যে ভালোবাসা ছিলো আকাশসম।

এই বইটা লেখার সময় অনেক বেশি মানসিক সাপোর্ট দিয়েছেন পলাশ দাদা। আমার লেখালেখির এই প্লাটফর্মে টিকে থাকার পিছনে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে জান্নাতুল ফেরদৌস ইচ্ছে আপু এবং অয়ন আপু। পাণ্ডুলিপিটা লেখার সময় সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করেছি *শারমিন* আপুকে। আপু কীভাবে আমার এত বিরক্ত মুখ বুজে সহ্য করেছে তা আমি জানি না। পাণ্ডুলিপিটা যখন শেষের দিকে তখন মাইগ্রেনের ব্যাথা নিয়েও আপু গল্পগুলো পড়েছে, এবং ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়েছে।

বইটা লেখার জন্য আমি কাউকে না জানিয়ে বেশ কয়েকবার চট্টগ্রাম গিয়েছি। সেখানে পরিচয় হয়েছিলো হৃদয় চাকমা এবং তুহিন চাকমার সাথে। তাদের আতিথিয়েতা সারাজীবন মনে থাকবে। একেবারে শেষ সময়ে এসে অন্তি চাকমা আপু তাঁদের ভাষা থেকে দুটো গল্প অনুবাদ করে দিয়েছিলো। এজন্য আপুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

লেখালেখি শুরু করার পর আমার বন্ধুমহল থেকে সেভাবে সাপোর্ট পাইনি। তবে দুইটা মানুষ সবসময় আমার পাশে ছিলো। তারা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ইমন এবং নাঈম। এদের সাপোর্ট না পেলে হয়তো আরো তিন বছর আগেই আমার কলম থেমে যেত।

সত্যি বলতে মিথগুলোই আমাদের সংস্কৃতির অংশ। এই মিথগুলোই আমাদের পরিচয় বহন করে অনেকাংশে। এই মিথগুলো হয়তো কালের পরিক্রমায় হারিয়ে যাবে, তখন আমরা নিজেদেরকেও হারিয়ে ফেলব। বাংলাদেশে মিথলজি জনপ্রিয় হচ্ছে, কিন্তু দেশীয় মিথ নিয়ে খুব একটা কাজ হচ্ছে না। তাই আমিই গুরুদায়িত্ব নিলাম দেশীয় মিথগুলো লিপিবদ্ধ করার। চাকমা মিথলজি দেশীয় মিথ সিরিজের প্রথম বই এবং আমার লেখা প্রথম বই। তাই এই বইয়েও অনেক ভুল থাকতে পারে। এজন্য পূর্বেই পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

সারোয়ার হাসান
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
২৩-০১-২০২৩

CamScanner

প্রকাশকের কথা

কুহক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমাদের প্রয়াশ ছিলো নতুন নতুন কিছু বিষয় তুলে নিয়ে আসা। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের এবারের পরিবেশনা "চাকমা পুরাণ"। ছোটভাইতুল্য সারোয়ার এতটা সাহসী একটা পদক্ষেপ নিয়ে ফেলবে তা প্রশংসার দাবি রাখে।

দেশীয় মিথ নিয়ে আমাদের কাজ এই শুরু হলেও এটি কিন্তু শেষ নয়। সামনে এমন আরো প্রজেক্ট নিয়ে আসছি আমরা। সারোয়ার নিজেই কাজ করছে এমন আরো বেশ অনেকগুলো প্রজেক্টে। আশা করি এর প্রতিটিই আপনাদের কাছে সমান পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

চাকমা পুরাণ নিয়ে কাজ করার সময় আমরা বেশ কয়েকজন থেকে পরামর্শ এবং সাহায্য পেয়েছি। তবে ওফেলিয়া চাকমা আপুর কথা আলাদা করেই বলতে হবে। বেশ কিছু তথ্যের উৎসের সন্ধ্যাণ দিয়ে এই কাজটিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। তার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আর তেমন কথা বাড়াবো না। আপনাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা অবশ্যই জানাবেন।

ইসমাত জারিন
প্রকাশক
কুহক কমিক্স এন্ড পাবলিকেশন
ismathjarin@gmail.,com

কোন পাতায় কি আছে

সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জুমচাষ / ১১
সাদা কাক / ২৫
ধুর্ত কচ্ছপ / ৩৪
ইঁদুরের দাঁত / ৩৬
হত্'বি আর ধত্'বি / ৩৮
চম্পক নগরী / ৭২
শিয়ালনীর উপস্থিত বুদ্ধি / ৭৫
ডুলো কুমোরী (ডোলা কুমারী) / ৮৪
পাগলা রাজা / ৮৭
আমগদ চাকমা / ৯২
বাঘ ও শামুকের দৌড় প্রতিযোগিতা / ১০০
ফিঙে, চড়ুই ও কাক / ১০৬

CamScanner

মিথগুলো আমাদের সংস্কৃতির অংশ,
আমাদের ইতিহাসের অংশ
মিথগুলোই আমাদের পরিচয় বহন করে,
এই মিথগুলো হারিয়ে গেলে,
হারিয়ে যাবো আমরা।

সৃষ্টিতত্ত্ব এবং জুমচাষ

সে সৃষ্টির আগের কথা! তখন সূর্য আলো দিত না, চাঁদ রশ্মি ছড়াত না, আকাশ ফুঁড়ে বারি ঝড়ত না, উত্তরের বায়ু বইত-না। তখন মানুষ ছিল না, গাছপালা, নদীনালা, বনজঙ্গল কিছুই ছিল না। প্রাণের স্পন্দন তখনও অনুপস্থিত।

ছিল কেবল অনন্ত আঁধার আর অপার জলরাশি। যার কূল নেই, কিনার নেই, কোন অন্ত নেই, শুরু নেই, শেষ নেই। হঠাতই এক সময় গোজেনের (ঈশ্বর) একঘেয়েমি কাজ করতে লাগল। একঘেয়েমি দূর করতে অনন্ত আঁধারের মাঝে, অকূল সমুদ্রের মাঝে সৃষ্টি করলেন এক বিশাল বটগাছ।

এই বটগাছ থেকে তিনি ছিঁড়ে নিলেন কয়েকটি পাতা। সে পাতা দিয়ে আসন তৈরী করলেন। তারপর বসলেন ধ্যানে। এই মহা-ধ্যানমগ্ন অবস্থায় কত শত বছর যে কেটে গেল তার হিসেব নেই। এ ধ্যান যেন অন্তহীন। একদিন পাতালপুরী থেকে উঠে আসলো গোজেনের সন্তান কাঁকড়া দৈত্য। বট গাছটার দিকে বেশ কিছুক্ষণ পলকহীন ভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি। কী ভেবে অতল সমুদ্রের তলা থেকে খুঁজে নিয়ে আসলেন মাটি। তা জমাতে শুরু করলেন গোজেনের সৃষ্টি করা বটগাছের শেকড়ের চারদিকে।

এমন সময় হঠাৎ একদিন গোজেনের ধ্যানভঙ্গ হলো। তখন তিনি চোখ মেলে চারদিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন সমুদ্রের ওপর সুন্দর স্থলভাগ। তিনি বুঝতে পারলেন এটি তারই সন্তান কাঁকড়া দৈত্যের কাজ।

CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

তাকে নিকটে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি?" গোজেনের লোকটি কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

গোজেন আবারও লোকটিকে একই প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি বলো?" লোকটি কিন্তু নির্বিকার। তিনি তৃতীয়বারও একই প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি বলো?" এবারও লোকটি আগের মতোই নিরুত্তর।

পর পর তিনবার লোকটিকে একই প্রশ্ন করার পর নিরুত্তর দেখে গোজেন খানিকটা বিরক্ত হলেন, হলেন আশ্চর্যও। তখন তিনি একটুখানি সময় নিয়ে চিন্তা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোজেনের মাথায় ধরা দিল, "এতো নিজেরই ছায়া!" পূর্বে আলো ছিল না বিধায় ছায়াও ছিল না, তাই ছায়ার সাথে গোজেন পরিচিতও ছিলেন না।

নিজের বোকামিতে গোজেন নিজেই যেন লজ্জিত হলেন। তখনই মনে পড়ল তিনি মানব জাতি সৃষ্টি করেননি। তাই নিজের এই ছায়াকে প্রাণ দিলেন গোজেন। এবং তার নাম রাখলেন 'কেবুগা'। এই কেবুগাই হলো গোজেনের আদলে সৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম মানব।

গোজেনের মনে পড়ল তিনি পৃথিবীর সকল প্রাণী জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, এই মানবেরও একজন সঙ্গিনী প্রয়োজন। তখন গোজেন নিজের শরীরের ময়লা থেকে সৃষ্টি করলেন এক মানবীকে। সেই মানবীর নাম রাখলেন 'কেবুগী'। এই কেবুগা ও কেবুগী-ই পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী। এদের সৃষ্টির পর গোজেনের মনে হলো পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হলো।

তখন তিনি এই দুই মানব-মানবীর ভোগ বিলাসের সকল দায়িত্ব ন্যস্ত করলেন যাবতীয় প্রাণীকুলের ও বৃক্ষরাজির উপর। এছাড়াও সকলকে একে অপরের উপকারে আসার জন্যও বলে গেলেন। এবার সৃষ্টির আনন্দে পরম প্রফুল্ল চিত্তে নিজ আবাস স্বর্গরাজ্যে চলে গেলেন।

CamScanner

গোজেন স্বর্গরাজ্যে চলে যাবার পর কেদুগা ও কেদুগী খুব আরামে জীব ধারণ করতে লাগল। ফলমূল খেয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ হত। ঝর্ণার পানি খেয়ে তারা তৃষ্ণা মেটাত।

কালক্রমে এদের সন্তান-সন্ততি হলো, হলো নাতি-নাতনীও। এক সময় বৃদ্ধ বয়সে কেদুগা-কেদুগী উভয়েই স্বর্গলোকে পারি জমালো। এদিকে তাঁদের নাতি-নাতনীদেরও হলো সন্তান-সন্ততি, বাড়তেই লাগল। এভাবে তাঁদের বংশধারা বেড়ে চললো।

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। প্রকৃতির নিয়মে সংখ্যাতীত বৎসর কেটে যাবার পর এক সময় ঘটলো পৃথিবীতে প্রচন্ড তুষারপাত! তুষারপাতের ফলে সূর্যের দেখা মিলল না বহুদিন, সূর্যের আলোর অভাবে পৃথিবীর গাছপালা মরে যেতে লাগল। হ্রাস পেতে থাকলো ফলবান বৃক্ষের সংখ্যা। ফলস্বরূপ খাদ্যাভাব দেখা দিল, পৃথিবীর সকল মানুষ অনাহারে মরতে শুরু করল। প্রতিটা পরিবার থেকে তিনজন চারজন মরেনি এমন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পৃথিবী মৃত্যুপুরীতে রূপ নিলো। পৃথিবী জুড়ে হাহাকার পড়ে গেল।

তখন গোজেন মানবজাতি সহ যাবতীয় প্রাণীকুল ও গাছপালাদের রক্ষার জন্য স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পাঠালেন কালেইয়্যা নামক এক দেবতাকে। ক্যালেইয়্যা দেবতার পৃথিবীতে আগমনের পর হিমপাত বন্ধ হলো বটে, কিন্তু এই মৃত্যুযজ্ঞ থামল না। মানুষ অনাহারে মরতেই থাকল।

প্রতিকারের জন্য কালেইয়্যা দেবতা পৃথিবীর যাবতীয় ফলের গাছের কাছে জানতে চাইলেন, "তোমরা কতোদিন মনুষ্য ও অন্যান্য প্রাণীকুলকে তোমাদের ফলমূল খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে?" কোন কোন সুস্বাদু ফলের বৃক্ষপ্রজাতি জবাব দিল, "এক-দুমাস কিংবা বড়জোর এক বছর" তবে জঘনা প্রজাতির বৃক্ষরা প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে জবাব দিল, "আমরা চিরকাল এদের বাঁচিয়ে রাখতে পারব, আমাদের ফলনের কখনো ঘাটতি দেখা দিবে না", অথচ কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল অল্প কিছুদিনের তফাতে জঘনার সকল ফল শেষ হয়ে গেল। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীরা সব জঘনা ফল খেয়ে

শেষ করে দিল মাসখানেকের ব্যবধানে। আবার শুরু হলো মারণযজ্ঞ, অনাহারে মানুষের জীবন বিনষ্ট হতে শুরু করল।

তা দেখে কালেইয়্যা দেবতা ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেলেন। এই ব্যর্থতা নিয়ে দেবতা গোজেনকে মুখ দেখাবেন কী করে? ক্রোধ সংবরন না করেই জঘনা প্রজাতির ফল গাছকে অভিশাপ দিলেন। এই অভিশাপের ফলে জঘনা ফলগুলো হয়ে গেল মানুষের খাবারের অযোগ্য। ব্যার্থতার বোঝা মাথায় নিয়েই দেবতা ফিরলেন স্বর্গলোকে।

কালেইয়্যা দেবতার ব্যর্থতার পর গোজেন এবার স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পাঠালেন গঙ্গাপুত্র বিয়াত্রাকে। দেবতা বিয়াত্রা ছিলেন চতুর প্রকৃতির। খুব সহজেই তিনি বুঝতে পারলেন শুধু ফল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারবে না। তাই তিনি মানবকল্যানে পৃথিবীর উর্বর জমিতে ছড়ালেন শস্য বীজ। সেখান থেকে জন্ম নিলো ধান, গম, ভূট্টা এবং যবের চাড়া। কিছুদিনের মধ্যেই ফসলের জোয়ার বইল। এখানেই থেমে থাকলেন না দেবতা বিয়াত্রা, মানুষকে শেখালেন আগুন জ্বালানো এবং আগুনের ব্যবহার। কেবল তাই নয়, তিনি মানব সমাজকে শেখালেন গৃহ নির্মাণের কৌশল। এবার মানব সমাজ সুশৃঙ্খল হতে শুরু করল, সাথে মৃত্য হ্রাস পেল। কিন্তু খাদ্যাভাব এর শঙ্কা পুরোপুরি দূর হলো না। তাই বিয়াত্রা ঠিক করলেন পৃথিবীতে মানব জাতির খাদ্যাভাব চিরতরে মেটাবার জন্য স্বর্গ থেকে মাহ লখী মা' (মহালক্ষী মা)-কে পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন।

বিয়াত্রা স্বর্গে পাঠালেন দেবতা কালেইয়্যাকে। কালেইয়্যা স্বর্গে গিয়ে মাহ লখী মা-কে ভক্তি সহকারে আমন্ত্রণ জানালেন পৃথিবীতে আসার জন্য। কালেইয়্যাকে দেখে দেবী খুব খুশি হলেন।

তিনি পৃথিবীতে যাবার কোন প্রতিশ্রুতি দিলেন না কিন্তু কালেইয়্যাকে মদ এবং ভাং দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। কালেইয়্যা সাগ্রহে তা গ্রহণ করে। অল্পতেই তার নেশা হয়ে যায়। নেশার ঘোরে তিনি আবল তাবল বকতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মাতাল হয়ে মাহ লখী মা-কে কখনো মা' কখনো 'দিদি' সম্বোধন করতে লাগলেন দেবতা কালেইয়্যা।

কালেইয়া দেবতার এই মাতলামো অবস্থা দেখে মাহ লখী মা তার সঙ্গে পৃথিবীতে যেতে রাজি হলেন না। কালেইয়া দেবতা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর এবার স্বয়ং বিয়াত্রা দেবতা গেলেন স্বর্গে। তিনিও যথারীতি ভক্তিসহকারে মাহ লখী মাকে আমন্ত্রণ জানালেন।

মাহ লখী মা তাঁকেও একইভাবে মদ ও ভাং সহযোগে আপ্যায়ন করলেন। বিয়াত্রা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই দেবীর এই পরীক্ষা খুব সহজেই ধরে ফেললেন। দেবতা বিয়াত্রা ভক্তি ভরে মদ গ্রহণ করলেন ঠিকই, কিন্তু পান করলেন না। তা কক্ষের এক কোনে লুকিয়ে রাখলেন। বিয়াত্রার বুদ্ধিমত্তা দেখে মাহ লখী মা প্রসন্ন হলেন এবং বিয়াত্রার সঙ্গে পৃথিবীতে আসতে সম্মতি জানালেন। মাহ লখি মা স্বর্গ থেকে বের হবার সময় ধান, গম, ভূট্টা ও যবসহ যাবতীয় শস্য দানা একটা ছোট্ট থলের মাঝে নিয়ে নিলেন।

এবার তিনি তাঁর প্রিয় বাহন 'মে-মে ছাগলী' (এক ধরনের ছোট্ট পাখি) এর পিঠে চেপে বিয়াত্রার সঙ্গে রওনা দিলেন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে। গোজেনের তৈরী পুরো ভ্রম্মান্ড পেরিয়ে আসতে লাগলেন স্থলের উদ্দেশ্যে। দেবীর বাহন ধারণাতীত গতিতে উড়তে থাকে। মাঝে মাঝে দেবতা বিয়াত্রা হিমশিম খেতে থাকেন মাহ লখি মার সাথে তাল মিলাতে।

স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আসার পথে বিশাল এক দুধ-সাগর পারি দিতে হয়। মাহ লখী মা তাঁর বাহনটির পিঠে চেপে সেই দুধ-সাগরের পাড়ে এসে থামলেন। তখন তিনি বিয়াত্রাকে ডেকে বললেন, "এই দুধ-সাগরটি পেরোবার জন্য কোন উপায় আছে কী তোমার কাছে?" এমন অবস্থার যে সৃষ্টি হতে পারে তা দূরদর্শী দেবতা বিয়াত্রা অনুমান করেছিলেন। তাই ব্যবস্থাও আগেই নিয়ে রেখেছিলেন। স্বর্গে যাবার পূর্বেই তিনি একটি কাঁকড়া, একটি শুকর ও একটি মাকড়সাকে দুধ-সাগরের পাড়ে রেখে গিয়েছিলেন। তাই মাহ লখী মার প্রশ্ন শোনার সাথে সাথেই এই তিন প্রাণীকে বিয়াত্রা ডেকে পাঠালেন।

দেবীর নির্দেশ পাবার সাথে সাথেই কাকড়াটি জলে নামল। কাকড়াটি জলে নামতেই তার পিঠের ওপর শূকরটি চড়ে বসল। তেমনি চতুর মাকড়সাটি দেবীর সুবিধার জন্য নুন সাগরের এপার থেকে ওপার পর্যন্ত নিজের জাল দিয়ে বেঁধে দিল। যা ধরে খুব সহজেই দেবী সাগর পেরোতে পারবে।

সে প্রস্তুত হতেই মে-মে ছাগলী পাখিটি মাহ লখী মা-কে পিঠে চাপিয়ে উড়ে গিয়ে বসল শূকরটির পিঠের ওপর। তখন কাঁকড়াটি জলস্রোতে ভেসে চলল নুন-সাগরের ওপর দিয়ে। এভাবে তিনজনের মধ্যেই মাহ লখী মা অতি স্বচ্ছন্দে নুন-সাগরটি পেরোলেন।

নুন-সাগরের ওপারে গিয়ে মাহ লখী মা পরম সন্তুষ্ট হয়ে কাকড়া, শূকর, মাকড়সা এবং বিয়াত্র দেবতাকে একটি করে বর দিলেন। তিনি বললেন-কাঁকড়াটি এখন থেকে স্থলে ও জলে সমানভাবে বিচরণ করতে পারবে।

শূকরটি পশুকুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্বির অধিকারী হবে। মাকড়সাটির পেটের আঁশ কখনো ফুরাবে না। শুধু কাকড়া, মাকড়শা আর শূকরকে বর দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বিয়াত্রর বুদ্ধিতে খুশি হয়েও তাকেও বর দিলেন। দেবী ঘোষণা করে দিলেন বিয়াত্র হবে প্রথম পূজ্য। মানবজাতি দেবপূজার সময় সবার আগে বিয়াত্রকে পূজা করবে।

বর প্রদানের পর মাহ লখী মা সবাইকে বিদায় জানালেন, "তোমরা এবার সকলে নিজ নিজ বাসস্থানে চলে যাও। আমি যথা সময়ে লোকালয়ে গিয়ে আবির্ভূত হবো।"

সবাই যার যার পথে চলে যাবার পর মাহ লখী মা পেঁচাকে ডেকে পাঠালেন। পেঁচা এসে দেবীকে শ্রদ্ধাভরে মাথা ঝোঁকালেন। দেবী শান্ত গলায় পেঁচাকে নির্দেশ দিলেন, "যাও, তুমি এক্ষুনি গিয়ে সর্বত্র জানিয়ে দাও আমার আগমনের কথা, দেবী মাহ লখি মার আগমনের কথা। দেবী স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে পা রেখেছেন।"

পেঁচাটি নির্দেশ পালন করল যথাযথ। নির্দেশ মতো পেঁচাটি সারা রাত ধরে উড়ে বেড়ালো পৃথিবীর এ প্রান্ত হতে ও প্রান্তে। আর তার কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করতে লাগল একটা শব্দ, "কু-লু-লু, কু-লু-লু"। এভাই রাতভর জানাতে লাগল মাহ লখি মা'র আগমনের বার্তা। তবে পূর্ব আকাশে যখন আলোর রেখা ফুটতে শুরু করেছে, তখন একটু বিশ্রামের জন্য একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসল পেঁচাটি।

এদিকে মাহ লখী মা'র মর্তে আগমনের খবরটি শুনে গ্রামবাসীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তারা একটি সোনার টোপর সঙ্গে নিয়ে সেই শুভ-সংবাদ জ্ঞাপনকারী পাখিটির খোঁজে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তারা দেখতে পেল একটি কাঠঠোকরা একটি মরা গাছের ডালে বসে ঠোকর মারছে গাছপোকার সন্ধানে। গ্রামবাসীরা ভাবল—এটিই বুঝি সেই শুভ-সংবাদ জ্ঞাপনকারী পাখিটি!

তাই তারা কালবিলম্ব না করেই এই কাঠঠোকরা পাখিকেই সোনার টোপরটি পরিয়ে দিল। এদিকে ঝোপের আড়াল থেকে পেঁচাটি যখন বেরুলো তখন এ দৃশ্য দেখতে পেয়ে আক্ষেপের স্বরে বলতে লাগল, "সারারাত পরিশ্রম করলাম আমি, অথচ একটুখানি অলসতার দরুণ সোনার টোপরটি বিনা পরিশ্রমে পেয়ে গেল কাঠঠোকরা পাখিটি।" এখান থেকেই একটা প্রবাদ বাক্যের প্রচলন হয়, "শেষ ভালো যার, সব ভালো তার"

মাহ লখী মা ভাদ্র মাসের কোন এক মঙ্গলবারে দুপুরের পরে লোকালয়ে এসে আবির্ভূত হলেন। তবে তাঁর পোশাকাদি ছিল একেবারেই সাধারণ। তিনি মর্ত্যে প্রকট হলেন সাদা পোষাক পরিহিতা মধ্য-বয়েসী এক বিধবা নারীর বেশে।

তিনি প্রথমেই গিয়ে উঠলেন মিচ্ছিভ্যা নামক এক বিপত্নীক গৃহস্তের বাড়িতে। তখন মিচ্ছিভ্যা বাড়িতে ছিলেন না। ঘরে তেমন খাবার না থাকায় গিয়েছিলেন খাবারের সন্ধানে। তার ছোট ছোট

তিন মেয়ে ছিল বাড়িতে। মেয়েগুলোর মুখ যেন অপরাজিতা ফুলের মতোই সুন্দর। কিন্তু ক্ষুধার ছাপ চেহারায় স্পষ্ট। তারা নিজের অনাহার ক্ষুধায় কাতর হয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। মমতাময়ী বিধবা মহিলাটি মেয়েদের জাগিয়ে তুললেন। প্রথমে তিনটি বোনের পরিচয় জেনে নিলেন, কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখলেন। নিজের পরিচয়ে বললেন, "আমি দূর গ্রাম থেকে এসেছি।"

পরিচয় পর্ব শেষ হতেই দেবী মা মুখে অমায়িক হাসি নিয়ে বারো-তেরো বছর বয়সী ঝিঙ্কিতার বড় মেয়েটিকে ডেকে বললেন, "তুমি একটি বেতের ঝুড়ি নিয়ে এসো।" মেয়েটি কথা অমান্য করল না, বিধবার মেয়েটিই দেবীর কথামতো বেতের ঝুড়ি নিয়ে এলো।

দেবী তার থলে খুলে তা থেকে একটি মাত্র চাল খুঁজে নিয়ে তা ঝুড়িটির মধ্যে রাখলেন। মেয়েটি অবাক চোখে দেবীর দিকে তাকিয়ে রইল। একটি চাল দিয়ে আবার কী হবে! এবার দেবী একটি কুলা দিয়ে ঝুড়িটি ঢেকে দিলেন। মেয়েটিকে দেবী নির্দেশ দিলেন, "উনুনের আগুন জ্বেলে তুমি এই ঝুড়ি থেকে পরিমাণ মতো চাল মেপে নিয়ে একটি হাঁড়ি দিয়ে তা রান্না কর। আমরা সবাই মিলে আহার করব।" মেয়েটি অবাক বিস্ময়ে মহিলাটির দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার ঝুড়ির দিকে তাকালো। কিন্তু তখনও তার বিস্ময়ের পালা বাকি ছিল। কুলা সরাতেই মেয়েটির চক্ষু চড়কগাছ। ঝুড়ি ভর্তি চাল। কিন্তু ক্ষুধার কাছে বিস্ময় হার মানলো। ঝুড়ি থেকে চাল মেপে নিয়ে তা হাঁড়িতে রান্না বসিয়ে দিল। রান্নার কাজ শেষ হলে অবশেষে মহিলাটি সহ তারা সবাই মিলে পেট ভরে আহার করল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার একটু আগে ঝিঙ্কিতা ফিরে আসে। তার হাতে কয়েক টুকরো বন্যআলু। বিধবা মহিলাটি তখন ঘরের এক কোণায় শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। বাড়িতে ফিরে বিধবাকে দেখে বেশ অবাক হয়। তখন তার বড় মেয়ে এগিয়ে আসে। ঝিঙ্কিতা নিজের মেয়েদের মুখ থেকে বিধবা মহিলাটির বিষয়-বৃত্তান্ত সবই শুনলেন, কিন্তু তেমন কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। পরে অবশেষে মহিলাটির সঙ্গে তার পরিচয় ও আলাপ হলো। বিধবা মহিলাটি

জানালেন, 'তিন কুলে আমার কেউ নেই। এ বাড়িতে আশ্রয় পেলে আমি একেবারেই থেকে যাব।'

তা শুনে মিজ্ঞিতা মনে মনে খুশিই হলেন এবং মহিলাটিকে তার বাড়িতে থাকার অনুমতি দিলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই মিজ্ঞিতা মহিলাটির প্রেমে পড়ে গেল। এ কথা বিধবাকে জানাতে দেরি করল না সে। কিছুদিন পর মিজ্ঞিতা ও মহিলাটির পুনর্বিবাহ হলো। এভাবে বুড়ি ও মিজ্ঞিতা ঘর-সংসার পেতে তিন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে থাকতে লাগলেন। এক শীতে বুড়ি মিজ্ঞিতাকে ডেকে বললেন- "বুড়ো, আজ তুমি জঙ্গলে গিয়ে একটি জুমের জমি চিহ্নিত করে এসো। সেখানে আমরা ফসল ফলাবো।"

মিজ্ঞিতা ছিলেন আসলে খুবই অলস প্রকৃতির লোক। কিন্তু বুড়ির কথা ফেলতে পারলেন না। সেদিন সকাল সকাল জঙ্গলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ খোঁজার পর জুম চাষ করার মতো উর্বর জমি পেয়ে গেলেন। সেই জমি চিহ্নিত করে বুড়ো ঘরে ফিরে আসলেন মিজ্ঞিতা।

এর কদিন পর বুড়ি পুনরায় মিজ্ঞিতাকে ডেকে বললে, "বুড়ো, আজ তুমি পুনরায় জঙ্গলে যাও। চিহ্নিত ঐ জুমের জমিতে থাকা কিছু জঙ্গল কেটে এসো।"

বুড়ির কথায় বুড়ো অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি দা ও একটি কুড়াল নিয়ে জুমক্ষেতটির কিছু অংশের জঙ্গল কেটে সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরে এলেন। কিন্তু মিজ্ঞিতা পরের দিন জুম কাটতে গিয়ে দেখে চিহ্নিত জমির সব জঙ্গল কাটা হয়ে গেছে। বুড়ো মিজ্ঞিতা এবার জুমের সব ঝোপ-ঝাড় রোদে শুকোতে দিলেন। চৈত্রের শেষদিকে বুড়ির কথামতো বুড়ো কাটা ও শুকনো জুমের মাঝে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। শুকনো জুম দাউদাউ করে জ্বলতে থাকল। এর দুদিন পর বুড়ো আর জুমে গেলেন না, এবার বুড়ি নিজেই গেলেন জুমে, বুড়ো বাসায় বসে থাকল। তিনি সেদিন জুমের আধপোড়া ডালপালা সব পরিষ্কার করে জুমক্ষেতে ধান ও অন্যান্য ফসলের বীজ রোপন করে এলেন।

এরপর বেশ কিছুদিন কেউই জুমে গেল না। তবে হঠাতই একদিন বুড়ি জুমে গিয়ে জুমের যাবতীয় বুনোঘাস ও আগাছাগুলো সাফ করলেন। এবার এই আগাছা জুমের উত্তর প্রান্তের একটি বিরাট গর্তের মধ্যে ফেললেন। তারপর গর্তের মুখটি পাথর চাপা দিলেন। কাজ শেষ হতেই বুড়ি কুড়ে ঘরে ফিরে আসলেন।

মাসখানেক কেটে গেল। চৈত্রের দাবদাহে শেষ বৈশাখের ঝড় এলো, আকাশ ফেটে বিদ্যুৎ চমকাল, মাঝে মাঝে বারি ঝড়ল, প্রকৃতি খানিকটা সজিব হলো, গাছে গাছে নতুন পাতা গজাল। বেশ কয়েকদিন পর বুড়ি বুড়োকে বললেন, "বুড়ো আজ তুমি জুমে গিয়ে জমিটা দেখো এসো। কোন বাঁদর বা অন্য বন্যপশু জুমের ফসল নষ্ট করছে কিনা সেদিকে নজর দিও।" বুড়ো বেরিয়ে যেতে নিলেই বুড়ি বাঁধা দিয়ে বলে, "কিন্তু একটি কথা মনে রেখো তুমি কখনো জুমের উত্তর প্রান্তে যাবে না।" বুড়ো ঘার নেড়ে বেরিয়ে গেল। দুপুর নাগাদ জুমের জমিতে বুড়ো পৌঁছালো। সেখানে পৌঁছে বুড়োর চোখ জুড়িয়ে গেল, "কী সুন্দর জুমক্ষেত"! ঘাসগুলো সব নিড়ানো। কোথাও আগাছা নেই। কচি-সবুজ ধানের চারাগুলো বাতাসে ঢেউ খাচ্ছে। যেন কোন স্বর্গলোক। এ দৃশ্য দেখে বুড়োর মনটি উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তিনি উৎফুল্ল চিত্তে জুমের এদিকে-ওদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

কিন্তু হঠাৎ-ই তার মনে পড়লো বুড়ির নিষেধের কথা। তিনি ভাবলেন, "বুড়ি কেন জুমের উত্তর প্রান্তে যেতে নিষেধ করলেন!" তার মনে কৌতুহল জাগলো। তাই তিনি নিষেধ অগ্রাহ্য করে গেলেন জুমের উত্তর প্রান্তে। কিন্তু সেদিকে গিয়েই বুড়ো শুনতে পেলেন কাদের যেন গলার চাপা আওয়াজ। যেন কেউ আকুতি ভরে মুক্তি চাচ্ছে। বাচ্চাদের মতো কান্না করছে। সেই আওয়াজ উদ্দেশ্য করে খোঁজাখুঁজি করতেই তিনি দেখতে পেলেন একটি গর্তের মুখে পাথর একটি চাপা রয়েছে। গর্তের কাছাকাছি গিয়ে কান পাততেই তিনি শুনতে পেলেন কারা যেন গর্তের ভেতর গুমড়িয়ে কাঁদছে।

CamScanner

বুড়োর কৌতূহলের পারদ এক ধাক্কায় যেন চূড়ায় উঠে গেল। কৌতূহল নিবারণের জন্য সেই গর্তের মুখে চাপা দেওয়া পাথরটি দুহাত দিয়ে সরিয়ে দিলেন। আশ্চর্যজনকভাবে দেখলেন গর্তের ভেতর ঠাসাঠাসি করে পড়ে রয়েছে অজস্র বুনো ঘাস ও আগাছা। গর্তের মুখটি খুলে দিতেই তারা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এসে সারা জুমক্ষেত জুড়ে যার যে জায়গায় ঝটপট বসে পড়লো। এ কান্ড দেখে বুড়ো রীতিমতো চমকে গেলেন। এ কী অবাক কান্ড! তখন তিনি বুঝতে পারলেন বুড়ি কেন জুমের উত্তর প্রান্তে যাবার জন্য বরণ করেছিলেন। বুড়ো অপরাধীর মতো কাচুমাচু অবস্থায় বাড়িতে ফিরে এসে সব ঘটনা বুড়িকে খুলে বললেন।

তা শুনে বুড়ি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কিন্তু স্বামীর উপর তো রাগ করে থাকা যায় না, তাই তিনি অসন্তুষ্ট স্বরে বললেন "বুড়ো, তুমি জুমচাষীদের জুম নিড়ানির কাজটা শুধু শুধু বাড়িয়ে দিয়ে এলে।" বুড়ি পরের দিন নিজেই জুমে গেলেন। বুড়িকে দেখা মাত্রই জুমের বুনোঘাস ও আগাছাগুলো যে যেদিকে পারে দৌঁড়াতে শুরু করল। সবাইকে ধরতে না পারলেও তিনি কিছু বুনোঘাস ও আগাছকে ধরে পুনরায় সেই গর্তের ভেতর পাথর চাপা দিয়ে চলে এলেন।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস নাগাদ বৃষ্টির জল পেয়ে জুমের ধান আরো বেশি সজীব হলো। চারাগুলো বেড়ে উঠতে লাগল অক্লান্তভাবে। এক সময় সেই ধানের চারাগাছে ফুল এলো - ফুল থেকে হলো ধান। ক্রমশ সেই ধান পোক্ত হতে হতে তা পেকে ওঠার সময় হলো- ধানের শীষে সোনালী রঙ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শ্রাবণের শেষ ও ভাদ্রের প্রথম নাগাদ জুমের ধান পুরোপুরি পেকে উঠলো। জুমের জমিতে সোনালী ধানের বন্যা বইল।

এমন অবস্থায় বুড়ি বুড়োকে ডেকে বললেন- "বুড়ো, এবার যাও তুমি, প্রতি গ্রামে গ্রামে গিয়ে প্রতিটি গেরস্তকে জানিয়ে দিয়ে এসো যে, তারা সবাই যেন নিজেদের প্রয়োজন মতো জুম থেকে পাকা ধান কেটে নিয়ে যায়।" বুড়ির কথা বুড়ো অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি গেরস্তকে খবরটি জানিয়ে দিয়ে এলেন।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে শনিবারে দূর-দূরান্তের প্রতিটি গ্রাম থেকে শেরক্তর নারী-পুরুষ মিলে হাতে একেকটি কাস্তে নিয়ে, বড় বড় বেতের ঝুড়ি কাঁধে ঝুলিয়ে মিছিঙা বুড়োর জুমক্ষেতে এসে হাজির হলো। এদিকে বুড়ি বুড়োকে দিয়ে জুমের মাঝখানে একটি উঁচু মঞ্চ তৈরী করিয়ে রেখেছিলেন।

গ্রামবাসীরা সবাই এসে জড়ো হলেই বুড়ি সেই মঞ্চের উপর উঠে গেলেন। সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি মাহ্ লখী মা, কয়েক বছর আগে তোমরা আমার আগমনের বার্তা পেয়েছো। কিন্তু আমি তোমাদের সামনে সেসময় সশরীরে হাজির হয়নি। কিন্তু এখন সময় এসেছে তোমাদের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার" এরপর দেবী সমবেত গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য করে জুমচাষের মহাত্ম, জুম কৃষির প্রতিটি পর্বের কাজ সবিস্তারে বর্ণনা করলেন এবং বললেন, "আমি যেই গৃহস্তের বাড়িতে অবস্থান করি সেই গৃহস্তের পরিবার সর্বদা ধন-সম্পদে, বিত্ত-বৈভবে পরিপূর্ণ থাকে, অভাব বলতে তার কিছুই থাকে না।"

"কিন্তু আমি কেবল সুগৃহিনী ও সৎচরিত্র ব্যক্তিদের ঘরেই অবস্থান করে থাকি। যে ঘরে সকাল-সন্ধ্যা অকথ্য ভাষা উচ্চারিত হয় সে ঘরে আমি থাকি। যে নারী কটুভাষী, হিংসা-পরায়না, পতিভক্তি হীন, পরগামী অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা সে ঘরে আমি থাকি না। যে নারীর স্বামী অলস, মদ্যপ, জুয়াখেলার প্রতি আসক্ত, ব্যভিচারী, পরনারী হরণকারী এমন ঘরে আমি থাকি না। আমি পাপাচার মুক্ত নারী তাই আমি পাপাচার মুক্ত ঘরেই অবস্থান করি" দেবী দম নিয়ে আবারো বলতে শুরু করলেন, "আমি বিয়াত্রা দেবতার আমন্ত্রণে মানব জাতির অন্ন সংস্থানের জন্য পৃথিবীতে এসেছিলাম। এই জুমচাষের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা আমি করে গেলাম। এখন আমি স্বর্গে অর্থাৎ স্বগৃহে ফিরে যাবো। স্বশরীরে আমি আর পৃথিবীতে থাকবো না। তবে আমি অদৃশ্যভাবে চিরকাল অবস্থান করবো ধানের শিষে এবং ধান ও চালের ঝুড়িতে। যে আমার প্রদর্শিত নীতিমালা মান্য করে চলবে আমি সদা সর্বদা তারই ঘরে দৃশ্যাতীতভাবে বিরাজমান থাকব।" এই কথাগুলো বলে মাহ লখী মা মিছিঙা বুড়োর দিকে

একবার তাকালো। তারপর চোখের পলকে শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন স্বর্গের উদ্দেশ্যে। যাবার আগে দেখলেন না মিছিভ্যা বুড়োর চোখ বেয়ে পড়া দু'ফোটা জল।

সাদা কাক

সে অনেক অনেক আগের কথা, তখনও মানুষ অট্টালিকা তৈরী করা শিখেনি। তখনও মানুষ কুড়ে ঘরের মাঝে বসবাস করে। তখনও সকল মানুষ আগুন জ্বালতে শিখেনি। মাংস পোড়াতেও শিখেনি সবাই। মানব জাতি শুধু ফল খেয়ে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করত। এ ঘটনা সেসময়েরই। একটা সাদা কাক মনের সুখে আকাশে উড়ছিল। মাঝে মাঝে আবর্জনা থেকে পোকা মাকড় খাচ্ছিল। আবার ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই কাকটার চোখে ভেসে উঠে একটি শ্রীফল গাছ। তাতে টকটকে লাল শ্রীফল ঝুলছে। সদ্য পাকা শ্রীফল দেখে কাকের জিহ্বে জল আসে। কাকটি শ্রীফল গাছের মগডালে এসে বসে।

কাকটি যখনই একটা ঠোকর মেরে একটি শ্রীফল খেতে যাবে অমনি অজানা কণ্ঠে চমকে উঠে। ভালো ভাবে পরোখ করতেই বুঝতে পারে শ্রীফলটিই চিৎকার করছে। কর্কশ গলায় বলছে, "ছিঃ ছিঃ, তোমার ঠোঁটটি এঁটো । তুমি পঁচা-টচা খাও, নোংরা খাও। এই ঠোঁট দিয়ে আমাকে খেতে পারবে না। আমাকে খেতে হলে আগে এই ঠোঁট পরিষ্কার করতে হবে। স্বচ্ছ পানি দিয়ে এই ঠোঁট ধুয়ে আসতে হবে।" শ্রীফলের কথা শুনে কাক বেজায় লজ্জা পেল। সে ভাবল- সত্যিই তো অমন সুন্দর লাল টকটকে ফল খাওয়ার আগে ঠোঁটটি আমার ধুয়ে আসা দরকার ছিল।

তাই সে ঠেটিটি ধোয়ার জন্য আবারো ডানা মেলল। উড়ে গেল পাশের একটি নদীতে। নদীতে স্বচ্ছ জল টলমল করছে। কাকটি যখনই নদীর জলে ঠোঁট ডুবাতে যাবে তখনই পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। এবার কথা বলে উঠল নদীর জল। কলকল শব্দে নদীর জল বলল, "তুমি ঐ নোংরা ঠোঁট এখনে ডোবাবে না, কোথা থেকে না কোথা থেকে কী খেয়ে এসেছ। তোমার নোংরা ঠোঁট থেকে দুর্গন্ধ আসছে। ঐ ঠোঁটটি ধুতে হলে বরং তুমি একটি মাটির হাঁড়ি নিয়ে এসো। তাতে জল ভরে নিয়ে তবেই তুমি তোমার ঠোঁটটি ধুতে পারবে।"

কাক এবার লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। লজ্জাভরা মুখ নিয়ে আবারো আকাশে ডানা মেলল। উড়তে উড়তে পৌঁছাল গাঁয়ের এক কুমোরের কাছে। কুমোরকে কাব্যিক স্বরে বলল,

"কুমোর রে কুমোর
ভাইটি আমার
দেবে হাঁড়ি তুলব জল
ধুবো ঠোঁট তবেই খাব
লাল শ্রীফল।"

কাকের কথা শুনে বয়েসের ভারে নুয়ে পড়া কুমোর চোখ তুলে তাকালো। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল বলল, "দেখছ না, আমার হাড্ডিসার শরীর। একটু জোরও অবশিষ্ট নাই। হাঁটতেই আমার কষ্ট হয়, মাটি তুলব কিভাবে? তাই হাঁড়ি-কলসিও বানানো হয় না বহুদিন।" এতোটুকু বলেই বুড়ো কুমোর খুকখুক করে কাশতে থাকে। একটু দম নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আবারও বলে, "তুমি অনুরোধ করে বলছ যখন অবশ্যই তোমার জন্য একটি হাঁড়ি বানিয়ে দেব। তবে এর জন্য যে তোমার মাটি আনতে হবে। আমি তো মাটি তুলে আনতে পারব না, পাশের ঝিলের থেকে মাটি নিয়ে আসো তো দেখি বাবু!"

কাক কাল বিলম্ব না করে উড়াল দিল। অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল ঝিলের পাড়ে। এবার মাটির কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলল,

"মাটি লো মাটি, কাঁদা মাটি
দেবে মাটি একটুখানি,
কুমোর বানাবে লাল হাঁড়ি
তুলব জল ধুবো ঠোঁট,
তবেই খাব লাল শ্রীফল।"

কাকের কথায় মাটি কিন্তু দ্বিমত পোষণ করল না। তবে সমস্যা দেখা গেল অন্য জায়গায়। সেই সমস্যার কথা মাটি চাপা গলায়

জানাতে ভুলল না, "একটুখানি কেন? যতো ইচ্ছে মাটি তুমি নিয়ে যেতে পার। কিন্তু বলি, মাটি তুমি খুঁড়বে কিভাবে? তোমার এই ঠোঁট দিয়ে নিশ্চয়ই মাটি খুঁড়তে পারবে না। তুমি বরং মহিষের কাছে যাও। তার কাছ থেকে একটি শিং বলে কয়ে ধার নিয়ে এসো। তা দিয়ে তুমি মাটি খুঁড়তে পারবে।"

কাক এবারো সময় নষ্ট করল না। মহিষের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। তবে চাইলেই তো লোকালয়ের কাছে বুনো মহিষ পাওয়া যায় না। অনেক অনেক খোঁজার পর একটা মর্দা মহিষের দেখা মিলল। সাথে সাথেই আকাশ থেকে নিচে নেমে এলো সাদা কাক।

"মহিষ রে মহিষ
শিং-অলা মহিষ
দেবে ভাই একটি শিং?
খুঁড়ব মাটি,
কুমোর বানাবে হাঁড়ি,
তুলব জল ধুবো ঠোঁট
তবেই খাব লাল শ্রীফল।"

কাকের মুখে অমন অলক্ষুণে কথা শুনে মহিষের চক্ষু চড়ক গাছ হয়ে গেল। কান দুটো হয়ে গেল খাড়া। রাগে গজরাজ গজরাতে মহিষ বলল, "তুমি বল কি! জ্যান্ত অবস্থায় আমি তোমাকে কেমন করে আমার শিং দেব? এই শিং আমার পৌরুষত্বের প্রতীক, আত্মরক্ষার হাতিয়ার। এ দিয়ে আমি শত্রুদের গুতো মারি, প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করি।" এতোটুকু বলেই মহিষ থামল। কিন্তু কাক তো নাছোড়বান্দা। সে কিছুতেই দমল না, করুণ স্বরে অনুরোধ করেই যেতে লাগল। অবশেষে মহিষের মন একটু নরম হলো। শান্ত স্বরে বলল, "তুমি তো দেখছি ভারি ঝামেলায় ফেললে বাপু, এভাবে তো শিং দেয়া যাবে না। তবে তুমি এতো করে অনুরোধ করছো যখন তোমাকে নিরাস করব না। যেদিন আমি বুড়ো হয়ে মারা যাব, সেদিন তুমি আমার দু'দুটো শিং তুলে নিয়ে যেতে পারবে। তোমাকে কেউ বাঁধা দিবে না। তুমি বরং ততোদিন অপেক্ষা করো।"

মহিষের কথা শুনে কাক তো তাজ্জব বনে গেল! ব্যাটা বলে কি! অমন পুরুষ্ট ও বলিষ্ঠ মহিষ কবে যে মারা যাবে কে জানে। আর যে হারে ঘাস খাচ্ছে তাতে সহজে মরার কোন সুযোগই নেই। তবে কি অনির্দিষ্টকাল ধরে তার মরণের অপেক্ষা করতে হবে? এতোদিন সে নিজেও বাঁচবে বলে মনে হয় না।

তাই কাক অন্য এক উপায়ের কথা চিন্তা করল। সাথে সাথেই তার মাথায় এসলো এক দুষ্টবুদ্ধি। সোজা আঙ্গুলে কাজ না হলে আঙ্গুল বাঁকাতে হবে। সে ফুরুৎ করে উড়াল দিয়ে হাজির হলো বাঘের গুহায়। বাঘ শুয়ে শুয়ে ঝিমাচ্ছে। কাক গিয়েই মাথা নুইয়ে কুর্নিশ জানাল বাঘকে। বনের রাজা বলে কথা। এতোটুকু শ্রদ্ধা তো করতেই হবে। বাঘ মাথা নাড়ল। এবার কাক কাব্যিক গলায় বলল,

"বাঘ মামা বীরের পুত,
মারবে মহিষ নেব শিং
খুঁড়ব মাটি
কুমোর বানাবে হাঁড়ি
তুলব জল
ধুবো ঠোঁট
তবেই খাব লাল শ্রীফল।"

কাকের এই নিবেদনটুকু শোনার পর বাঘ প্রসন্ন হলো। শোয়া অবস্থা থেকে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর গম্ভীর স্বরে বলল, "ভাগ্নে, এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব, অতি উত্তম প্রস্তাব। কতদিন মহিষের মাংস খাই না, মহিষ মারার কথা বলায় আমার তো জিহ্বায় জল এসে গেছে।" কথাটা বলে বাঘ জিহবা দিয়ে ঠোঁট চাটল। পরোক্ষণেই হতাশ স্বরে বলল, "কিন্তু দেখছ না, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। বুড়ো হলে যা হয়, নানা অসুখে-বিসুখে আমার শরীরও শুকিয়ে কাহিল হয়ে গেছে। চোয়ালেও তেমন জোর নেই। সেই পুরুষ্ট মর্দ মহিষটার ঘাড় মটকে দেব এখন আমার অমন শক্তি কই! তাছাড়া আগের মতো ক্ষিপ্র গতিতে দৌড়াতেও পারি না।" বাঘ হতাশার নিঃশ্বাস ফেলল। পরোক্ষণেই আবার তার চোখ চকচক

করে উঠল, "তুমি বরং এক্ষুনি যাও এক দুধেল গাভীর কাছে। আমার জন্যে কিছু দুধ আনোগে। দুধ খেলে আমার শরীর পুনরায় তাজা হবে। শরীরে বল ফিরবে। আগের মতো শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠব। তখন আমি বেয়াড়া মহিষটিকে মেরে তার সুস্বাদু মাংস খেতে পারব, আর তুমিও মহিষের শিং দু'টো নিয়ে যেতে পারবে।"

বাঘের কথায় সন্তুষ্টি ভরে মাথা নাড়ল। বাঘ মন্দ বলেনি। এখন সকল ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র দুধেল গাভীই। কাক আবার গহীন অরণ্য ছেড়ে ছুটে আসলো লোকালয়ে। ছুটে গেল এক গোয়াল ঘরে গাভীর কাছে। গিয়ে গাভীটাকে মিনতি করে বলল,

"শুনো মামি দুধেল গাভী,
দেবে দুধ খাবে বাঘ,
হবে বল মারবে মহিষ
নেব শিং, খুঁড়ব মাটি
কুমোর বানাবে হাঁড়ি
তুলব জল ধুবো ঠোঁট
তবেই খাব লাল শ্রীফল।"

কাকের কথা শুনে বেচারি গাভী মিনমিনে গলায় বলল, "দেখছ না বোনপো, আমার ছোট্ট বাছুরটির চেহারা। প্রায় মারা যাবার অবস্থা। গেরস্ত আমাকে সারাদিন বেঁধে রাখে গোয়াল ঘরে। তাজা ঘাস খেতে দেয় না। কেবল এক বেলা শুকনো খড় খেতে দেয়। তা দিয়ে কি দুধ হয় বল? তাই তোমাকে বলছি শোন- যদি দুধ তুমি পেতে চাও, তাহলে আমাকে কিছু তাজা ঘাস এনে দাও।"

গাভী বেচারির করুণ অবস্থার কথা শুনে কাকের মন খারাপ হয়। গাভীর জন্য মায়া হয়। মায়া হয় বাছুরটার জন্যেও। সে প্রতিজ্ঞা করে যেভাবেই হোক ঘাস নিয়েই আসবে। তাই কাক উড়ে যায় বিলের ধারে। সেখানে ঝপাট ঝপাট শব্দ করে বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে ঘাসের দল। কাক ঘাসের কাছে গিয়ে বলে,

"ঘাস রে ঘাস সবুজ কচিঘাস,
দেরে ঘাসের আঁটি পরিপাটি,
খাবে গাভী হবে দুধ
খাবে বাছুর হবে বল,
মারবে মহিষ লেবে শিং,
খুঁড়বে মাটি কুমোর বানাবে হাঁড়ি
তুলবে জল ধুবো ঠোঁট
তবেই খাব লাল শ্রীফল।"

কিন্তু এবারও কাককে হতাশ হতে হল। এখানেও বিরাট বাধা। কাকের কবিতা শুনে ঘাস জানাল, "আমি তোমাকে কেমন করে ঘাস দেব? ঘাস তো তোমাকে কেটে নিয়ে যেতে হবে। সেজন্য লাগবে একটা কাস্তে। তোমার কাছে কাস্তে আছে কি?" কাক মাথা নেড়ে অসম্মতি জানায়। কাক হতাশ স্বরে বলে, "আমি বলছিলাম কি, তুমি যাও কামারের কাছে। তার কাছ থেকে একটি কাস্তে এনে যত ইচ্ছে ঘাস কেটে নাও। আমার কোন সমস্যা নেই।"

ঘাসের পরামর্শ মেনে নিল সাদা কাক। ঘাসের কথা মতো এবার কাক গেল এক বুড়ো কামারের কাছে। কামার তার থুরথুরে শরীর নিয়ে উঠানের সামনে বসে আছে। কাক গিয়ে কামারকে সম্মান জানিয়ে বেশ বিনয়ের স্বরে বলল,

"কামার রে কামার শিল্পী চমৎকার,
দেরে আমার কাস্তে কাটব ঘাস,
খাবে গাভী হবে দুধ,
খাবে বাছা হবে বল
মারবে মহিষ লেবে শিং
খুঁড়বে মাটি কুমোর বানাবে হাঁড়ি
তুলব জল ধুবো ঠোঁট
তবেই খাব লাল শ্রীফল।"

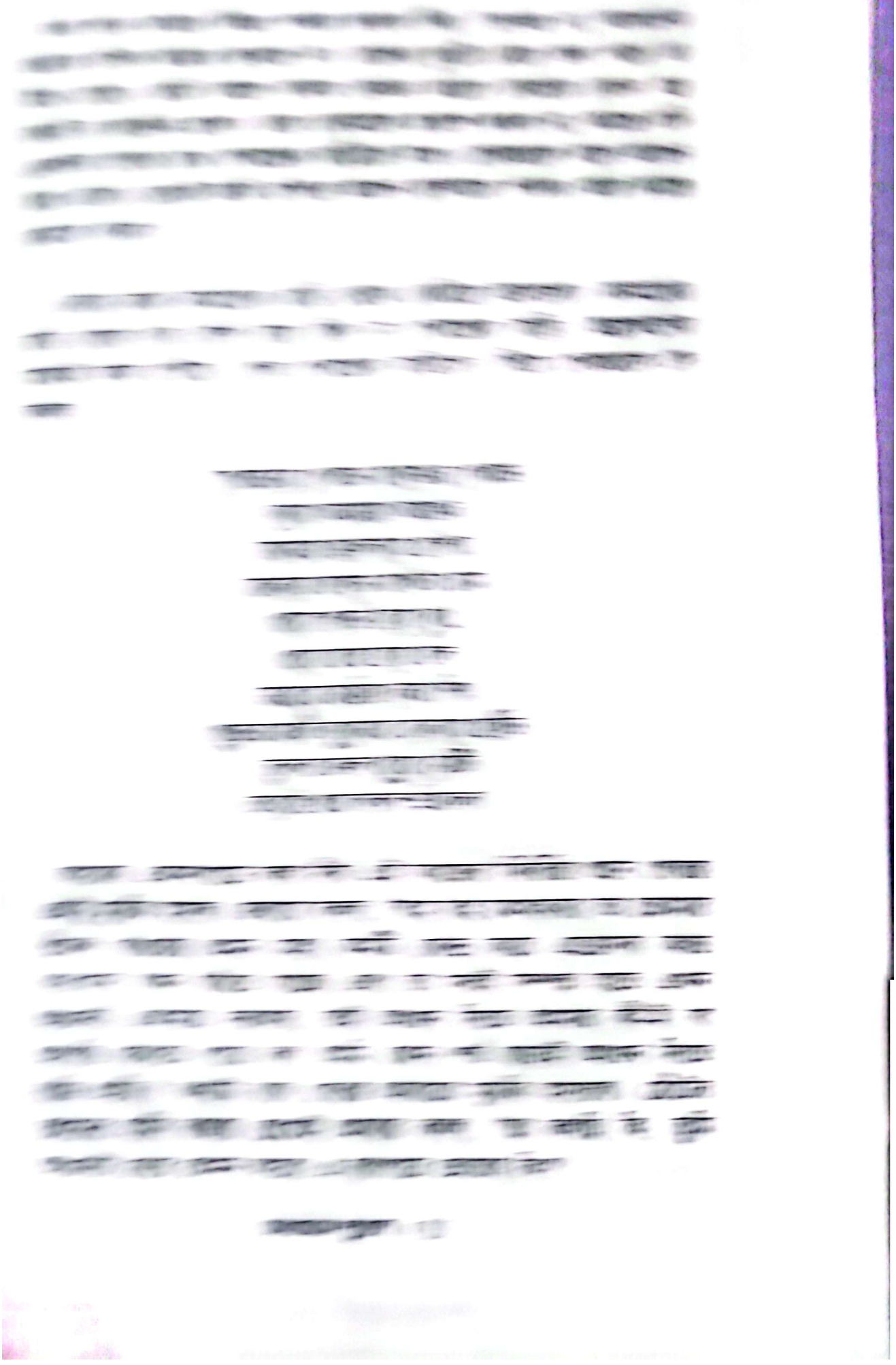

কাক হতাশ ভাবে মাথা নাড়ল। গেরস্ত খানিকক্ষণ চিন্তা করল। তার মুখের হাসি বজায় রেখে আবার বলল, "একটা উপায় মাথায় এসেছে আমার। এভাবে ছাড়া আগুন নেয়ার কোন বিকল্প পথ নেই। আমি একটি আগুন গুঁজে দেওয়া খড়ের আটি তোমার লেজের সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছি। তুমি এটা নিয়ে উড়ে যাবে।" এই বলে গেরস্ত একটি খড়ের আটিতে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার গুঁজে দিয়ে তা কাকের লেজে বেঁধে দিল।

আগুন পেয়ে কাক খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল। কিছু না ভেবেই আকাশে ডানা মেলে উড়াল দিল। শ্রীফল খেতে এখন আর আটকায় কে? এই আটিটা কামারের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। কামার খুব সহজেই কাস্তে বানিয়ে ফেলবে। তা দিয়ে ঘাস কেটে দুধেল গাভীকে খাওয়ালে গাভীও দুধ দিবে। সেই দুধ খেয়ে বাঘ মামা শক্তি ফিরে পাবে। আর তারপর বাঘ মামা মহিষের ঘাড় মটকাতে পারবে খুব সহজেই। তখন মহিষের শিং নিতেও কেউ বাঁধা দিবে না, মাটি খুঁড়তেও কোন সমস্যা হবে না। মাটি নিয়ে কুমোরকে দিলেই একটা হাঁড়ি তৈরী করে দিবে। সেই হাঁড়িতে জল নিয়ে খুব সহজেই ঠোঁট ধুতে পারবে। আর শ্রীফল খেতেও কেউ বাঁধা দিবে না। এসব ভাবতে ভাবতেই আকাশে উড়তে লাগল সাদা কাক। কিন্তু একটুখানি উড়তেই দমকা বাতাসে ধুমায়িত খড়ের আটটা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

এবার কাকতো পরল মহা বিপদে। এই আগুনে তো শুধু তার পাখা না, পুরো দেহ ঝলসে যাবে, বাঁচার কোন রাস্তাই নেই।

কাক কোন উপায়ান্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। ঠিক তখনই নজর কারে গেরস্তের বাড়িতে রাখা মস্তবড় গামলা। তাতে রাখা কালো তরল। সাত পাঁচ না ভেবে তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাবার জন্য গেরস্তের উঠোনে রাখা কালো রঙের জলে ভর্তি গামলার দিকে পড়ি মরি করে উড়ে গিয়ে তার জলে দিল এক ডুব।

এতে আগুন নিভে গিয়ে কাকের প্রাণ বাঁচলো বটে, কিন্তু কালো রঙে ডুব দেওয়ার ফলে ধবধবে সাদা কাক হয়ে গেল কুচকুচে কালো। সেই থেকে কাকের রঙ চিরতরে হয়ে গেল কালো।

আর এদিকে আগুন নিয়ে কাকের পৌঁছানো সম্ভব হলো না কামারের কাছে, কামারের দ্বারা বানানো হলো না কাস্তে, কাটা হলো না ঘাস, গাভীর হলো না ঘাস খাওয়া, হলো না সে পয়স্বিনী, বাঘের হলো না দুধ খাওয়া, তাই তার দ্বারা মারা হলো না বেয়াড়া মোষটাকে, পাওয়া গেল না মহিষটার শিং, খোঁড়া হলো না মাটি, মাটি না পেয়ে কুমোরর দ্বারা বানানো হলো না মাটির হাঁড়ি, হাঁড়ির অভাবে কাকের ধোয়া হলো না এটো ঠোঁট এবং ঠোঁট না ধোয়ার ফলে কাকের আর কক্ষনো খাওয়া হলো না অমন লোভনীয় টকটকে লাল শ্রীফল।

শেষে মনের দুঃখে শ্রীফল না খেয়েই কালো কাক আকাশে উড়ে গেল।

CamScanner

ধূর্ত কচ্ছপ

এক বনে এক বাঘ ছিল। সে প্রতিদিন ভোরে গুহা থেকে বেরিয়ে শিকারে যেত। প্রতিদিন কিছু না কিছু পেয়েই যেত। সেই মাংস খেয়ে আবার গুহায় ফিরে আসত। এভাবেই তার দিন যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন বাঘ শিকারে গিয়ে সারাদিনেও কোন কিছু পেল না। বনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সব চষে বেড়িয়ে একটা হরিণ তো দূরে থাক একটা খরগোশ পর্যন্ত পেল না। এদিকে ক্ষুধায় পেটে ইঁদুর দৌড়াচ্ছে।

কিন্তু কী আর করবে, শিকার না পেলে খাবার তো আর পেটে যাবে না। বাঘ নিজের লেজ বাঁকা করে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার সামনে দিয়ে যেতে দেখে একটি কচ্ছপ। বাঘটি আর কি করবে! ক্ষুধা যে আর মানে না। কোন উপায়ন্তর না পেয়ে সে সিদ্ধান্ত নিল সামনে থাকা কচ্ছপটি দিয়ে নিজের ক্ষুধা মেটাবে। যে ভাবনা সে কাজ, বাঘটা তার থাবা দিয়ে কচ্ছপটিকে শক্ত করে ধরে ফেলল। এর আগে বাঘটি কখনো কচ্ছপ খায়নি। কচ্ছপ খাওয়ার কথা সে ভাবতেও পারেনি।

হরিণ, খরগোশ, মোষ এমন নানা প্রকার শিকার করার মতো প্রাণী থাকতে সে কচ্ছপের কথা ভাবতে যাবে কেন, কিন্তু **"নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো"**। আজ যখন অন্য শিকার পাওয়া যাচ্ছে না তখন এই শিকারটা দিয়েই নিজের ক্ষুধা মেটাতে হবে। কিন্তু ধরে ফেললেই তো খাওয়া হচ্ছে না। খোলস অনেক শক্ত। কামড় দিলেও দাঁত ফুটছে না, নখ দিয়েও মারা যায় না। অনেক শক্ত। বাঘটি নিজের শক্তি দিয়ে অনেকক্ষণ কামড়া কামড়ি করল। নখ দিয়ে মারার চেষ্টা করল। দুই হাত দিয়ে আছাড় মারল কিন্তু না কোন ভাবেই সম্ভব না। খাওয়ার কোন জো নেই। বাঘটি অবাক হলো। ভাবছে এখন কী করা যায়? কিভাবে খাওয়া যায় এই কচ্ছপটিকে। কচ্ছপটি দেখছে বাঘটি তাকে খাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। কিন্তু এভাবে নিজের খোলসে বাঘের আঁচড়

কাটাও বিরক্ত লাগছে। তাই সে ছাড়া পাবার জন্য একটি বুদ্ধি বের করল। সে খোলস থেকে মুখ বের করে বলে উঠল,

"সাহস নেই কিছু নেই হাতির মুখ খা,
ছড়াই নিয়ে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খা।"

কচ্ছপটির কথা শুনে যেন বাঘটির হুশ ফিরল। বাঘটি ভাবল আসলেই তো ছড়াই নিয়ে গিয়ে জলে ভেজালে কচ্ছপটি নরম হয়ে আসবে। কিছু কিছু শক্ত জিনিস জলে ভেজালে নরম হয়। এটাও হয়তো নরম হতে পারে। কচ্ছপটির কথা সে সত্যি মনে করল।

এবার বাঘটি কচ্ছপটিকে জড়িয়ে ধরে ছড়ার দিকে এগিয়ে গেল। কিছু দূর যাওয়ার পর বাঘটি সামনে দেখতে পেল একটি নদী। বাঘটি তা দেখে খুব খুশি হলো। বাঘটি ভাবল এবার এই কচ্ছপটিকে জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খাব। সে কচ্ছপটিকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে নদীর কিনারায় ছেড়ে দিল। বাঘটি যেই জলে তাকে ছেড়ে দিল কচ্ছপটি নিজের হাত পা বের করে গভীর জলে চলে গেল। এদিকে তা দেখে বাঘটি বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল।

CamScanner

ইঁদুরের দাঁত

এখন যে মিথ নিয়ে গল্পটা বলব সেইটা শুধু চাকমাদের মধ্যেই প্রচলিত না, প্রতিটা গ্রামেই এ মিথ নিয়ে গল্প প্রচলিত আছে। গল্পের কাহিনী একটু ভিন্ন হতে পারে কিন্তু বিষয়বস্তু সবখানেই এক।

অনেক আগে পার্বত্য অঞ্চলের জঙ্গলে বসবাস করত এক নিঃসন্তান দম্পতি। স্বামী সারাদিন কাঠ কাটত বনে। আর স্ত্রী ঘরে বসে রান্নাবান্না করত আর অপেক্ষা করত কখন স্বামী ঘরে ফিরবে। স্বামী সারাদিন কাঠ কেটে যে কড়ি উপার্জন করত তা দিয়েই তাদের দিন চলে যেত। দুজনের সংসারে কোন অশান্তি ছিল না। ছিল না সুখের কোন কমতি। শুধু দিনশেষে একটা সন্তানের অভাববোধ করতো দুজনেই। ছেলেপুলে ছাড়া কি একা একা সংসার ভালো লাগে? তাই প্রতিদিন কাঠুরিয়ার স্ত্রী মাহ লখি মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে থাকে।

এরকম চলতে চলতে এক পর্যায়ে কাঠুরিয়ার স্ত্রীর উপর মাহ লখি মা প্রসন্ন হন। ফলে তাদের কোলজুড়ে এক পুত্র সন্তানের আবির্ভাব ঘটে। কাঠুরিয়া দম্পতি বেজায় খুশি। ছেলেকে নিয়ে বেশ সুখে দিন কেটে যায় তাদের। এর মধ্যে তাদের ছেলে খানিকটা বড় হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ছেলেটির দুধদাঁত পড়ে ভালো দাঁত গজায়। কিন্তু বিপত্তি ঘটে ভিন্ন জায়গায়। কিছুদিন পরই ছেলেটির দাঁতগুলো আবার পড়ে যায়। ব্যাপারটা নিয়ে কাঠুরিয়া দম্পতি ভীষণ দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পরে। যেহেতু তাদের একমাত্র সন্তান তাই চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। জীবনের শুরুতেই এভাবে দাঁত হারিয়ে ফেললে সারা জীবন অতিবাহিত হবে কিভাবে?

এর মাঝেই কাঠুরিয়ার স্ত্রী আবারো সন্তান সম্ভবা হয়। কিছুদিন পর কাঠুরিয়ার কোল জুড়ে আসে আর এক পুত্র সন্তান। দিন যায়, সে বড় হয়। কিন্তু আবারও পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। প্রথমে

দুধদাঁত পড়ে নতুন দাঁত গজায়, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেগুলো পড়ে যায়। এভাবে পর পর পাঁচটা সন্তান হয় কাঠুরিয়ার। প্রত্যেক সন্তানের সাথে একই ঘটনা ঘটতে থাকে। এতে বড্ড বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে কাঠুরিয়া আর তার স্ত্রী। শেষে আবার মাহ লখি মার কাছে প্রার্থনা শুরু করে তারা। মাহ লখি মা কিন্তু এবারও প্রসন্ন হয়। একদিন রাতে এক ইঁদুরকে নির্দেশ দেয় সব ছেলের চোয়ালে দাঁত ফিরিয়ে দিয়ে আসতে। সে দাঁত যেন ইঁদুরের দাঁতের মতোই শক্ত আর মজবুত হয়। মাহ লখি মার কথা মতো একদিন রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে সকল ছেলের চোয়ালে ইঁদুর দাঁত বসিয়ে দিয়ে আসে।

তাই চাকমাদের মধ্যে একটা মিথ প্রচলিত রয়েছে, "দুধদাঁত পরলে সেটা যদি ইঁদুরের গর্তে ফেলে ইঁদুরের কাছে ভালো দাঁত চাওয়া হয়, তবে পরবর্তীতে যে দাঁত উঠে তা অনেক বেশি শক্ত এবং মজবুত হয়।"

CamScanner

হঅ'বি আর ধঅ'বি

মাহ লখি মার স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের পরের ঘটনা। এক গায়ে এক বুড়ো আর বুড়ি বাস করত। বুড়ো ছিল প্রচন্ড কর্মঠ। কাজ নিয়ে কখনোই অলসতা করত না। বুড়োকে বুড়ি সাহায্য করত। দুজন মিলে জুম চাষ করত। ভালো জাতের ধান, আবাদ হতো প্রচুর। তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশিই ফলন হতো। খেয়ে শেষ করতে পারত না। তাছাড়া তিল, কার্পাস, কুমড়ো, মার্পা, চিনা বাদাম তো চাষ করতই। মাহ লখি মা তাদের দু'জনকে সব দিয়েছিল। শুধু দেননি সন্তানাদি। এ নিয়ে বুড়ির কষ্টের অন্ত নেই। বুড়োও অনেক কষ্ট পেত কিন্তু বুড়ির সামনে কখনো প্রকাশ করত না। কিন্তু একদিন মাহ লখি মা বুড়ো বুড়ির এ কষ্টও দূর করে দিল। বুড়ো বয়সে তাদের কোল জুড়ে এলো এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান। পরীর মতো দেখতে হলো মেয়েটা। চেহারা থেকে লাবন্য যেন চুইয়ে পড়ে। বুড়ো খুব খুশি হয়ে আদর করে ওর নাম রাখল হঅ্'বি।

কিন্তু সুখ যে আপেক্ষিক। চাইলেই সারাজীবন কারো ধারে সুখের বসতি থাকে না। বুড়ো বুড়ির কপালেও তাই এ সুখ বেশিদিন টিকল না। কালবৈশাখীর মতো ঝড় নেমে এলো বুড়ো বুড়ির সংসারে।

বুড়ো আর বুড়ি এক সকালে কুড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জুমের উদ্দেশ্যে। জুমের জমিতে বেশ কিছু আগাছা জমেছে। ধানের চাড়াগুলো সবে কচিপাতাগুলো ছাড়িয়ে বড় হতে শুরু করেছে। এ সময় একবার আগাছা পরিষ্কার করে দিলে পরে আর আগাছা বাড়তে পারে না। ধানের ফলনও হয় খুব ভালো।

জৈষ্ঠ্য মাসের তীব্র রোদ। এ রোদে বসে বুড়ি নিড়ানি দেয়। কিন্তু রোদের তাপ যে অসহনীয়! চারধারে খাঁ খাঁ রোদ্দুর। কাছে পিঠে কোথাও ছায়াটুকু পর্যন্ত নেই। যে কটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে জুমের মাঝখানে, সেগুলোরও ডালপালাতে পাতা নেই। জুম পোড়ার

আগুনে সব ঝলসে গেছে। পাতা মেলতে তাদের এখনও অনেক দেরি। আষাঢ়ের বৃষ্টির আগে পাতা মেলার কোন সম্ভাবনা নেই। বুড়ি কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বুড়োকে বলে, "চল না বুড়ো! একটু জল খেয়ে আসি। ভারী তেষ্টা পেয়েছে।"

কিন্তু সেসময় বুড়ো কাজ ফেলে যেতে নারাজ। যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করতে চায় বুড়ো। প্রতিদিন এই রৌদ্রের মাঝে নিড়ানি দেয়া অসম্ভব। তাই একদিনেই পুরো কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে চায়। বুড়ো জবাব দেয়, "আরে সবুর! সবুর! এপাশটা সমান করে নিই আগে। দেখছিস না কী রকম আগাছা হয়ে আছে? তাড়াতাড়ি নিড়ানি শেষ করতে না পারলে ধানগুলো যে আর বাড়বে না।" কিন্তু বুড়োর কথা বুড়োর মুখেই রইল! এদিকে বুড়োর নিজেরই খুব তেষ্টা লেগেছে। তাই তাড়াতাড়ি কাজটা একপেশে করে নিয়েই ছুটলো দু'জনে জলের খোঁজে।

কিন্তু কোথায় জল! চারদিকে শুধু খাঁ খাঁ করছে। জৈষ্ঠ্যের তীব্র দাবদাহে চারদিকের সব জল শুকিয়ে মাঠঘাট ফেটে চৌচির। অন্যদিন তারা খাবার পানি আনত নদী থেকে 'কত্তিতে' (এক প্রকার মাটির তৈরী জলপাত্র। দেখতে অনেকটা গাড়ুর মত, গলাটা সরু আর লম্বা) ভরে। আজ তাড়াহুড়ায় আনতে ভুলে গিয়েছিল। তাই এখন মহা ফ্যাসাদ বেঁধেছে।

বুড়ো বুড়ি হন্যে হয়ে জল খুঁজতে লাগল। তৃষ্ণায় তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। একটু জলের জন্য বেরিয়ে যাবার অবস্থা। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎই বুড়ি একটা নিচু জায়গা আবিষ্কার করল। ওটা বোধহয় আগে কোন ডোবা ছিল, অনেকগুলো হরিণের পায়ের দাগও আছে সেখানে, আর কিছুটা জল জমে রয়েছে সেগুলোর খাঁজে খাঁজে। তৃষ্ণার তীব্রতায় সাত পাঁচ না ভেবে বুড়ি ঐ জলটাই মরুভূমির মত শুষে নিলো মাটিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে। কিন্তু হলো হিতে বিপরীত। এই অল্প জলে বুড়ির গলাটা পর্যন্ত ভিজলনা। তেষ্টা মেটা দূরে থাক, সেটাকে বরং আরো দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল।

অপরদিকে বুড়ো খুঁজে পেয়েছে এক কাঁকড়ার গর্ত। ভেতরে বেশ পরিষ্কার ঠান্ডা জল। তা দেখে বুড়োর চোখ চকচক করে উঠল। মহা উল্লাসে বুড়ো আঁজলা ভরে জল নিয়ে নিল। খেতে যাবে এমন সময় বুড়ি এসে হাজির। বুড়ি এসে কাঁদো কাঁদো হয়ে তাকে বলল, "বুড়ো! আমাকে একটুখানি খেতে দে না?"

বুড়োর নিজেরই তখন তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে। মাথা কাজ করছে না ঠিক মতো। এসময় বুড়ি এসে বাগড়া দিতেই বুড়োর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। বিরক্তি জড়ানো কর্কশ স্বরে বুড়ো বলল, "দূরর, দুরর" (চাকমা ভাষায় দূর মানে কচ্ছপও)

বুড়োর মুখের কথা ফেলতে না ফেলতেই ঘটে গেল তাজ্জব কান্ড! বুড়ি দূর হবার বদলে হয়ে গেল কচ্ছপ। বুড়ো ভুলেই গিয়েছিল তারা সত্য যুগে বাস করে। মুখে কিছু বললেই সেইটা ফলে যাবে। এবার কচ্ছপরূপী বুড়ি কিছুক্ষণ বুড়োর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর জলের উদ্দেশ্য পা বাড়াল। অনেক্ষণের প্রচেষ্টায় কচ্ছপ নদী খুঁজে পেল। আর মহানন্দে তাতে নেমে গেল।

এদিকে বুড়ো জল খাবে কি? বুড়োর তো মুখের বাক্য বন্ধ হয়ে গেল চোখের সামনে অত বড় তাজ্জব ব্যাপারটা ঘটতে দেখে। কী বলতে কী ঘটে গেল চোখের পলকে! কিন্তু বুড়োর যখন হুশ ফিরল ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কচ্ছপরূপী বুড়ি নদীতে নেমে গেছে। ব্যাপারখানা বুঝে উঠতেই বুড়ো কপাল চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। বুড়িকে হারিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বুড়ো সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ি ফিরে এলো। এদিকে বাড়িতে বুড়ো বুড়ির মেয়ে অপেক্ষা করছিল তাদের ফেরার। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় মেয়ের দুশ্চিন্তাই হচ্ছিল। এতো দেরি করে না বুড়ো বুড়ি। কিন্তু বাপকে একা ফিরতে দেখে মেয়েটা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল তাকে, "বাবা! মা কই?"

মেয়ের কথা শুনে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকল বুড়ো। ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল তার। কত বড় পাপ করে এসেছে তা এই ছোট্ট মেয়েটাকে কিভাবে বলে? ভিতরের হাহাকার দ্বিগুণ হলো যখন

মনে পরল ছোট্ট মেয়েটি কখনও মায়ের কাছ ছাড়া হয়নি। এখন বুড়ো কী বলে বোঝাবে মা যে আর কোন দিন ফিরবে না? মেয়ের ছলছলে চোখের দিকে তাকিয়ে আরো একবার কেঁপে উঠল বুড়ো। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত নিল কোনভাবেই মেয়েকে এই কথা বলা যাবে না। তাই বুকে পাথর বেঁধে মেয়েকে বুড়ো বলল, "আসবেরে তোর মা, শিগগিরই আসবে। তোর মা একটু মাসির বাড়িতে গেছে। কাল সকালেই ফিরে আসবে।"

বুড়োর কথা শুনে রাতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পরল মেয়েটা। বুড়ো কিন্তু ঘুমাতে পারল না। সারারাত চোখের জল ফেলল। আর ভাবতে লাগল কী পাপ করেছে সে। বুড়িকে ছাড়া সে নিজেও বা কিভাবে থাকবে? সকাল হতেই মেয়েটা তার বাবাকে আয়ার জিজ্ঞেস করল, "মা কোথায়? মা আসে না কেন?" এবার বুড়ো জবাব দিল, "তোর মা মনে মাসির বাড়ি থেকে এখন আবার জুমে গেছে। বিকেল হতেই দেখবি ঠিক ফিরে এসেছে।"

মেয়েটি তাতেই আপাতত প্রবোধ পেল বটে, কিন্তু মাকে না পেয়ে উসখুস করে কাটাল সারাদিন। বেচারি ঘন ঘন ভেতর বাহির করল। পথের পানে চেয়ে চেয়ে বসে রইল সারাদিন ওই বুঝি আসছে তার মা! ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো। আর দেখতে দেখতে বেলা পড়ে গিয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো, কিন্তু তবুও তার মাকে আসতে দেখা গেল না। বুড়ো দূর থেকে এসব দেখছিল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। কিন্তু মেয়েকে যে বলতেও পারছে না। মেয়েটি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। বাপের কাছে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বারে বারে জিজ্ঞেস করতে লাগল তার বাবাকে, কখন আসবে তার মা। কখন সে মায়ের কোলে বসে ভাত খাবে? কখন মা তাকে দৈত্যের গল্প শুনিয়ে ঘুম পারাবে?

এদিকে মেয়ের দুঃখে বাপের নিজের চোঁখেও তখন জলের ধারা নেমেছে। পরম স্নেহে মেয়েকে বুকে টেনে নিয়ে বারে বারে বুঝাতে লাগল, "কাঁদিসনে মা! কাঁদিসনে! তোর মা নিশ্চয় আসবে কাল সকালে।"

অনেক করে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোন রকমে মেয়েটিকে একটু শান্ত করল বুড়ো। আনাড়ি হাতে চারটে রাঁধল বুড়ো। আর তখনই বুঝতে পারল উনুনের পাশে বুড়ি কত কষ্ট করে। আগুনে ঝলসে তারপর রান্না করে বুড়োকে খাওয়ায়। বুড়ির জন্য মনটা আবারো হাহাকার করে উঠে। কোন মতে রান্না শেষ করে মেয়েকে খাওয়াল। শেষে নিজেও কিছু মুখে দিল। তারপর মেয়েকে বুকে নিয়ে শুতে গেল বিছানায়। মেয়েটি কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেল। তবে বুড়োর সারারাত চোখ ফেলতে পারল না। এপাশ ওপাশ করেই কাটল সারারাত।

পরদিন সকাল না হতে মেয়েটি আবার বায়না ধরলো তার মায়ের কাছে যাবার জন্যে। এবার কিন্তু বুড়ো আর মিথ্যা বুঝ দিতে পারল না। মেয়ের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বুড়ো তাকে নিয়ে গেল নদীর ধারে। কিছুক্ষণ নদীর দিকে তাকিয়ে থেকে নিরবে চোখের জল ফেলল। তারপর এক এক করে খুলে বলল তাকে সব কথা। শেষে বলল, "দেখ, তোর মা এখন কচ্ছপ হয়ে আছে ঐ নদীর জলে। সে আর ফিরবে না। পানিতেই থাকতে হবে তাকে, আর ফিরতে পারবে না। এটাই তোর মায়ের নিয়তি। চাইলেও আমরা তোর মাকে ফিরাতে পারব না।"

বাপের কথা শুনে মেয়েটি একেবারে হাটু গেড়ে বসে পড়ল মাটিতে। 'হাউ, মাউ' করে কাঁদতে লাগল মায়ের শোকে। বিলাপ করতে করতে মূর্ছা গেল কয়েকবার। তার সে কান্নার শব্দ পৌঁছাল নদীর তলাতেও। কান্না শুনে হঠাৎ করে ভেসে উঠল কচ্ছপটি। পানির উপরে গলা বাড়িয়ে ডেকে বলল মেয়েকে, "কাঁদিস না মা! কাঁদিস না! নিয়তির লেখন যায় না যে খন্ডন। কপালের লেখনে আমি এখন কচ্ছপ হয়ে আছি। ঘরে ফেরার উপায় নেই। মিছিমিছি কেঁদে দুঃখ বাড়াসনে। তোর এই কান্না যে আমার সহ্য হয় না। তোর যখনই দেখতে ইচ্ছে করবে, ঘাটে এসে হাততালি দিবি। আমি যেখানেই থাকি, নিশ্চয়ই দেখতে আসব তোকে।"

সেই থেকে হঅ্'বি তার মায়ের কথা মনে পড়লেই নদীর ধারে চলে আসে। হাত তালি দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে কচ্ছপটি ভেসে উঠে

জলের উপর। তীরে কাছে এসে দেখা দিয়ে যায় মেয়েকে, নানান কথ বলে তার সঙ্গে। মেয়েকে নানারকম গল্প শোনায়, নদীর জলের তলায় থাকা জীব জন্তুর গল্প শোনায়, মাছের সাঁতার কাটার গল্প শোনায়। জলপরীর গল্প শোনায়। জলের তলায় থাকা কাকড়া দৈত্যের গল্প বলতেও ভুলে না। এভাবেই সারাদিন চলে যায়। সন্ধ্যা হলে কচ্ছপ জলে ডুব দেয় আর মেয়ে বাড়ি ফিরে।

এদিকে বুড়িকে হারিয়ে বুড়ো একেবারে একলা হয়ে পড়ে। জুম চাষ করার আর সামর্থ্যও থাকে না। দিন যত যায় গোলার ধানও ফুরিয়ে আসে। বড় কষ্টে পড়ে যায় সে মেয়েকে নিয়ে। কিন্তু এভাবে তো আর বসে বসে খাওয়া যায় না। কিছু একটা তো করতেই হবে তাকে।

একা একা জুম চাষ করতে না পারলেও বুড়োর একটা কাজ জানা ছিল। বেত দিয়ে নানারকম জিনিসপত্র বানাতে পারত সে। তাই বন থেকে সে বাঁশ, বেত কেটে আনল। তাই দিয়ে টং (চাল রাখার জন্যে এক প্রকার বেতের টুকরী) আর কুলো বানালো। মেয়েও বাপকে সাহায্য করল। এবার এগুলো বিক্রি করার পালা। বুড়ো প্রতিদিন সকালে নিজের কুড়ে থেকে বেতের জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে যেত। আর গ্রামে গ্রামে ঘুরে সেই বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করত। বিক্রি করার জন্য গলা ছেড়ে চাকমা ভাষায় একটা ছন্দ আওড়াতো,

"ভাত দিবে জরা জরা,
তোন দিবে টরা টরা
টং হুলো লবানি,...
মা বোন পাড়া?"

বাংলা:-

"ভাত দিয়ো মুঠো ভরা
তরকারি দিয়ো থোড়া,
টং কুলো নেবেনি,
মা বোন পাড়া?"

সারাদিন বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করে যা আসত তা দিয়েই কোনমতে জোরেশোরে জীবন কাটাচ্ছিলো বুড়ো আর তার মেয়ে।

****

বুড়ো একদিন বেতের জিনিসপত্র নিয়ে এক ভিন গাঁয়ে আসে। সে গাঁয়ে থাকত এক বুড়ি, অনেক কাল হলো তার স্বামী মারা গেছে। একটি মাত্র মেয়ে নিয়ে তারও দিন যাচ্ছে কোন মতে। মেয়ের নাম ধন্যাবি। বুড়োর মেয়ের প্রায় সমান বয়সী। দেখতে শুনতেও বেশ। চাল চলনও ভালো। এদিকে বুড়ো যখন প্রথম বার বেতের জিনিসপত্র নিয়ে সে গাঁয়ে যায়, তখন প্রথম দেখাতেই বুড়োকে মনে ধরে যায় বুড়ির। দিন যায় মাস যায়। ধীরে ধীরে বুড়োর প্রতি বুড়ির প্রেম বাড়তেই থাকে। রাস্তা দিয়ে বুড়োকে যেতে দেখলেই তাকে ডেকে বসায়, ঠান্ডা পানি খেতে দেয়। পাশে বসে হাওয়া করতে করতে সুখ দুঃখের গল্প করে, বলে, "আহা বুড়ো! তোমার তো ভারি কষ্ট! থাকত যদি আমার মত তোমার এক বুড়ি, তাহলে নিশ্চয়ই আসতে দিতনা তোমাকে এই রোদ্দুরে।" বুড়ির হাবভাব বুড়োর ঠিক লাগেনা। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুড়িকে এড়িয়ে যায়। বুড়ি হতাশ হয়ে বসে থাকে। কিন্তু হাল ছাড়ে না। কোন কোন দিন বুড়ি বলে, "আহা বুড়ো! তোমার কষ্ট আর চোখে সয়না। থেকেই যাও না হয় আজ এখানে।"

বুড়ো তাড়াতাড়ি বলে উঠে, "না না আজ থাক। কচি মেয়েটা একলা ঘরে রয়েছে। সারাদিন কোন মতে তার কাটে, সন্ধ্যে হলেই কেঁদে ভাসিয়ে দেবে। আমি আজ যাই।"

কী করে বুড়োর মন ভোলানো যায়, সেই চেষ্টায় কোন কমতি রাখে না বুড়ি।

একদিন বুড়ি একেবারে চেপে ধরল বুড়োকে রাখবার জন্যে। অন্যদিনের মত আজও মেয়ের কারণ দেখাতে বুড়ি বলল তাকে, "থাক, থাক! মেয়ের ভাবনা ভাবতে হবে না তোমায়। পাশের গাঁয়েই

তো তোমার বাড়ি, আমারও মেয়ে রয়েছে, পাঠিয়ে দিচ্ছি তাকে। ওকে এখানে নিয়ে আসবে। তাও আজ থেকে যাও"

বুড়োর আর কোন আপত্তিই খাটল না সেদিন। কথার প্যাচে প্রথমে কিছুক্ষণ আটকালো। তারপর বুড়োর বেতের তৈরী মালামাল, একেবারে ঘরের ভিতরে নিয়ে লুকিয়ে রাখল বুড়ি, যাতে বুড়ো পালাতে না পারে। আজ কোন ভাবে বুড়োকে ছাড়তে চায় না সে। এবার মেয়েটাকে পাঠিয়ে দিল পাশের গাঁয়ে, বুড়োর মেয়েকে আনতে। সন্ধ্যা নাগাদ বুড়োর মেয়েকে নিয়ে হাজির হয় ধঅ্'বি। হঅ্'বি আর ধঅ্'বির সখ্যতা গড়ে উঠে খানিকক্ষণের মধ্যেই।

রাত্রে খাবার জন্যে একটা বুনো মুরগি জবাই করল বুড়ি। তারপর ভাল করে রাঁধল। এবার বুড়ো আর তার মেয়েকে খেতে দিল খুব যত্ন করে। মা মেয়ে নিজেরাও খেল। ঘুমানোর আগে সবাই মিলে গল্পও করল।

রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়েছে, তখন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী চুপি চুপি নিজের কাপড়ে আর বুড়োর কাপড়ে একটা গিঁট বেঁধে নিল বুড়ি। তারপর বুড়োর গা ঘেসে বুড়িও শুয়ে পড়ে আর সকাল হবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এদিকে ভোর না হতে, বাড়ির মোরগটা কী করে জানি বুড়ির এই কান্ডটা টের পেয়ে যায়। তখন মোরগটা ডানা ঝাপটে ডেকে উঠে,—

"কঁক্-ক-রে! কঁক্!
বুজ্যালই বুড়ি জদন বান্যন্দে-
জক্-রে! জক্!"

বাংলা:

কঁক্-রে-কঁক্!
বুড়ো আর বুড়ি গাটছড়া বেঁধেছে,
মজার কান্ড দেখ!

মোরগের কর্কশ চিৎকারে বুড়ির ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভাঙতেই বুড়ি শাসিয়ে উঠল মোরগটাকে কপট রাগে, "হারামজাদা তোর সাহস তো কম না, আমার পোষা মোরগ হয়ে বুড়োর পক্ষে কথা বলছিস! ভোর হোক, দাড়া! কালই তোকে জবাই করে দিচ্ছি!"

এদিকে মোরগের চিৎকারে বুড়োরও তখন ঘুম ভেঙেছে। হাই তুলতে তুলতে নিচের তাকাতেই দেখে সত্যি সত্যি তার গাটছড়া বাঁধা হয়ে আছে বুড়ির কাপড়ের সঙ্গে! আর বুড়ি তো যেন আকাশ থেকে পড়ল। এমন ভাব করল যেন কিছুই জানে না, "ওমা! এ কী কান্ড বুড়ো! গাটছড়া বাঁধল কে? তুমি নিশ্চয়ই বেঁধেছ। এই ছিল তোমার মনে? ছি! ছ! ছি! এখন বিয়ে না হলে মুখ দেখাই কি করে লোকের কাছে? আর মেয়ে দুটোই বা বলবে কী?"

ফাঁদে পড়ে গেল বুড়ো। কী করবে ভেবে পায় না। বুড়ি যে তাকে এভাবে ফাঁসাবে তা ভাবতেও পারেনি। কিন্তু এখন লোকের কাছে মুখ দেখাবে কী করে? তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকটা বাধ্য হয়ে বুড়োর বিয়ে করতে হল বুড়িকে। বিয়ে করে তো বুড়ির বাড়িতে থাকা যায় না। তাই একেবারে নিয়ে এল তাকে নিজের বাড়িতে। কিন্তু বিয়ের পর তাদের জন্য কী দূর্ভোগ অপেক্ষা করছে তা ভাবতেও পারেনি বুড়ো।

বুড়োর বাড়িতে নতুন বুড়ি আসতেই শুরু হল হঅ্'বির আসল দুঃখের দিন। বাড়িতে এসে পা দিতেই বুড়ি নিজের আসল রূপ প্রকাশ করল। কালে কালে প্রকাশ পেতে লাগল তার হিংসুটেপনা। বুড়োর মেয়ে কিনা সতীনের মেয়ে। তাকে কোন ভাবেই মেনে নিতে পারছিল না বুড়ি। বিষ নজর পড়ে গেল মেয়েটার উপর। এই মেয়েকে তো বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানো যায় না। বুড়ি তাকে দিয়ে সংসারের সব কাজকর্ম করানো শুরু করে। নদী থেকে জল আনায়। খাবারের বাসন মাজায়। খেতেও দেয়না ঠিক মতো। কাজেকর্মে একটুখানি গাফিলতি দেখলেই মেয়েকে মার শুরু করে। পান থেকে চুন খসলেই গালমন্দ আর অভিশাপ বুড়ির মুখে যেন নিত্য লেগেই থাকে।

বুড়োর মেয়ে কাজ করে যায় প্রাণপণে। কোন ভাবেই বুড়িকে রাগাতে চায় না। কিন্তু বুড়ি যেন তার খুঁত খুঁজতেই থাকে। বাপকে কিছুই বলতে পারে না বুড়ির ভয়ে। কারণ বাপ সারাদিন বাইরে থাকে, এসময় বুড়ির কাছেই তাকে থাকতে হয়। বুড়ি মারধর করলে কিছু বলতেও পারবে না। তাই নিরবে সব সহ্য করে নেয়। শুধু একেবারে যখন অসহ্য হয়ে উঠে, তখন এক ফাঁকে সে নদীর ধারে গিয়ে কাঁদতে বসে।

আর ওদিকে তার মা তার সে কান্না শুনে ভেসে উঠে জলের তলা থেকে। কূলের কাছে এসে বোঝাতে থাকে মেয়েকে, "কাঁদিসনি মা! কাঁদিসনি! সবই কপালের লেখন, সয়ে যা!"

শুধু যে মেয়ে কচ্ছপ বুড়ির সাথে দেখা করতে আসে তা না। মাঝে মাঝে বুড়ো আসে কচ্ছপ বুড়ির সাথে দেখা করতে। কিন্তু কখনো কথা বলে না। চুপচাপ বসে থাকে। আর নিরবে চোখের জল ফেলে। বলারই বা কী আছে। যে পাপ করেছে সে পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত হয় না। বুড়ি কচ্ছপও অভিমানে রা করে না।

বুড়োর ঘরে থাকতে থাকতে বুড়িও একসময় জানতে পারল তার সতীনের কথা। তার সতীন এখনও কচ্ছপ হয়ে বেঁচে আছে নদীর জলে। আর বুড়ো আর তার মেয়ে গিয়ে ডাকলে জলের উপর ভেসে উঠে। তাদের দেখা দেয়, তাদের সাথে কথা বলে। বুড়ো এখনো তার সতীনকে ভালবাসে। সাথে সাথে তার মনের মধ্যে একটা সন্দেহের ঘুনে পোকা বাসা বাঁধে, "সতীন বুড়োকে কানপড়া দিচ্ছে!" এসব ভাবনা মাথায় আসতেই বুড়ি রেগে ফেটে পড়ে। তার মাথায় শুধু একটা কথাই কাজ করতে থাকে, যেভাবেই হোক কচ্ছপটাকে হত্যা করতেই হবে। আর এতেই শান্তি মিলবে বুড়ির।

কচ্ছপটা ধরার জন্যে হরেক রকম তোড়জোড় শুরু করে দিল বুড়ি। লোক দিয়ে বার বার নদীর উজানে জাল ফেলাতে লাগল বুড়ি। ভাটিতে বসাল একসার টেরা, আর নদীর দু'ধারে ফেলে রাখল মেলাই বঁড়শীর টোপ। বুড়ির মতলবটা শুরুতেই বুঝতে পারে হঅ্'বি। তাই আগে ভাগেই নদীর ধারে চলে যায়। হাত তালি

কিন্তু কচ্ছপ জলের তল থেকে উপরে ভেসে উঠে। আর তখন মাকে হুশিয়ার করে দেয়,

"হেই-ই মা।
উজুর গেলেহ চেয়াত বাজিরে
লামান গেলেহ তেরাত বাজিরে।
কুলত থলেহ দক্ষিত বাজিরে।
মাঝেদে থাক।"

মানে:

উজানে গেলে চাঁই
আর ভাটিতে আসলে আটকে পড়বে ভেঁসালে।
কূলের কাছে এলে টেঁকশীতে গাঁথবে।
মাঝ নদীতেই থাকো।

সময়মত মেয়ের হুঁশিয়ারী পেয়ে কচ্ছপটা সেদিন আর ধরা পড়ল না। তারপরের দিনও না, এমন কি তারপরের দিনও না। কিন্তু এতে বুড়ির রাগ যে কমল না-ই বরঞ্চ রাগ বেড়ে গেল বহুগুণ। আরো বেশি বেশি চাঁই ফেললো নদীতে। সাথে বড়শী আর ভেঁসালে আছেই। এবার কিছু লোকের হাতে কোঁচও তুলে দিল।

এদিকে কচ্ছপটি পড়েছে মহা বিপদে। সে না যেতে পারে উজানে, না যেতে পারে ভাটিতে। কূলের কাছে গেলেও বিপদ। সব সময় মৃত্যু ভয় মাথায় নিয়ে চলাফেরা করে। এই বুঝি কোঁচ গেঁথে গেল, এই বুঝি চাঁইয়ে আটকা পড়ল, এই বুঝি গলাতে বড়শি ফুটল।

এতে করে কচ্ছপটির খাবারের সমস্যা দেখা দিল। চড়ে বেড়ে খাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল তার। কিন্তু এমনি করে কতোদিন না খেয়ে থাকা যায়। পেটে খাবার না পড়লে এমনিতেই যে সে মারা যাবে। পর পর বেশ কিছুদিন উপোস থাকার পর খিদের জ্বালা আর সহ্য হলো না। কচ্ছপটা জলের উপরে মাথা ভাসালো। খাবারের খোঁজে পাড়ের ধারে আসলো আর অমনি বুড়ির একখানা কোঁচ গেঁথে গেল খাঁ-চ্‌' করে। সাথে সাথে জেলের দল হইচই শুরু

CamScanner

করেছি, তুই আমার বুক পোড়াচ্ছিস্ কেন? মায়ের দুধের দাম নেই।"

শিউরে উঠে হত্'বি। তাড়াতাড়ি কচ্ছপটাকে আগুনের আঙ্গার থেকে নামিয়ে আনল। তারপর আবার উলটে দিয়ে আগুনে ফেলল। এবারেও কচ্ছপটা আগুনের জ্বলনিতে চিৎকার করে উঠল। ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠে বলল "মা, মা'রে, তুই এতো পাষাণ হৃদয় হলি কিভাবে? তুই কি এই পিঠে চড়িসনি? তোকে এই পিঠে নিয়ে কত বেড়িয়েছি। তুই আমার পিঠ পোড়াস কেন?"

তার কাতরানি সইতে না পেরে মেয়েটি ফের উলটে দিল কচ্ছপটাকে। যেদিকেই উলটে দেয়া হোক না কেন কচ্ছপের যন্ত্রণা তো কমে না। আগুনের তাপে ছটফট করতে থাকে। হত্'বি আবার উল্টিয়ে দেয়। এভাবেই চলতে থাকে। এদিকে মেয়ের কান্না আর কচ্ছপের ছটফটানি দেখে বুড়ি হেসে কুটিকুটি। হোক না কচ্ছপ, সতীন তো সতীনই? সতীন কখনো আপন হতে পারে না। সতীনের মনে সব সময় শয়তানি বুদ্ধি লেগেই থাকে। স্বামীকে আলাদা করতে চায়। তাই সতীনের কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখা উচিত না। বুড়ি গগণ কাঁপিয়ে হেসে উঠে।

এভাবে আগুনে পুড়তে পুড়তে এক সময় কচ্ছপটা মারা যায়। হত্'বি চোখের জলের যেন বাধ সাধে না। বুক ফাটিয়ে কান্না করে সে। কিন্তু তার এই কান্না কে দেখবে? বুড়ির ঠোঁট থেকে তো হাসিই সরে না। এবার বুড়ি হত্'বিকে আদেশ করে কচ্ছপটা ধুয়ে কেটে নিয়ে আসতে। একটু ময়লাও যেন অবশিষ্ট না থাকে।

হত্'বি চোখে জল নিয়ে নদীর ধারে যায়। নিজ হাতেই পুরো কচ্ছপটা কাটে। প্রতিটা টুকরো করার সময় মনে হয় নিজের কলিজা টুকরো করছে। কাটা শেষ হতেই ভালো করে মাংসটা ধুয়ে নেয় সে। তারপর সে মাংস নিয়ে বাড়িতে ফিরে। মাংস পেয়ে খুব খুশি হয় বুড়ি। মাংস নিয়ে রান্না করতে যায়। উনুনে আগুন জালে। তারপর মাংসটা বসিয়ে দেয়। এদিকে উনুনের আঁচ পেয়ে

তরকারির ঝোলটা যখন ফুটছে টগ্বগ্ টগ্বগ্ টগ্বগ্ করে, তখন হাঁড়ির ভেতর থেকে যেন একজন বলে উঠে,

"ৱৱগ্ ৱৱগ্ সুদিনঅ মাধা খাং!
"ৱৱগ্ ৱৱগ্ সুদিনঅ মাধা খাং!"

বাংলাঃ

টগবগ! টগবগ! সতীনের মাথা খাই।

"কী অলুক্ষণে কান্ড! মরে গিয়েও এই ডাইনি পিছু ছাড়ছে না। চুলোর মধ্যে ফুটতে ফুটতে সতীনের মাথা খেতে চাচ্ছে", ভাবতে ভাবতে ভয়ে কেঁপে উঠে বুড়ি। বুকের মাঝে যেন নিশ্বাস আটকে গেছে তার। ভয়ে ভয়ে আবারো মাংসের তরকারিটা খুন্তি দিয়ে নাড়া দেয়, সাথে সাথেই পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। রান্না করা তরকারিটা আর খেতে সাহস করল না বুড়ি। "এ তরকারি খেলে নিশ্চিত কোন অলুক্ষণে কান্ড ঘটবে। তার চেয়ে ভালো তরকারিটা ফেলে দেই। সতীন তো মরেছেই, আর কোন দুশ্চিন্তা নেই" এসব ভাবতে ভাবতে বুড়ি তরকারিটা ফেলে দিয়ে এল আস্তাকুঁড়ে।

কয়েকদিন যেতে দেখা গেল, একখানা লাউশাকের চারা গজিয়েছে সেখানে। হঅ্'বি সেটার খুব যত্ন নিতে লাগল হরেক রকম ভাবে। কখনো আগাছা ছাড়িয়ে দিতে লাগল। কখনো আবার পানি দিতে লাগল। বেশ কয়েকটা ডাল গুজে দিল গাছের গোড়ায়। দেখতে দেখতে চাড়া বড় হয়ে উঠল। ছোট্ট চাড়া থেকে একটা লক্লকে আগা বেরিয়ে ডাল বেয়ে উঠল রান্নাঘরের চালে। কয়েক দিনের মধ্যে পুরো চাল ছেয়ে গেল লাউয়ের কচি ডগায়।

কালে কালে তার ফুল হল আর একটা লাউয়ের কুঁড়িও দেখা দিল এক সময়। একটুখানি বড় হতেই সেটা ঝুলে পড়ল চালের বাতা থেকে দুয়োরের ঠিক সামনে, বাড়তে লাগল দিনে দিনে। কিন্তু সমস্যা বাঁধে অন্য জায়গায়। প্রতিবার বুড়ি ঘর থেকে বেরোবার সময় একবার মাথার মধ্যে লাগে, আবার ঢুকার সময় ঠকাস করে

কপালে লাগে। বুড়ির তাতে মেজাজ খারপ হয়ে যায়। রাগে ফুলতে ফুলতে বুড়ি গলা ছেড়ে গাল মন্দ দিয়ে উঠে রাগে, "আঃ মোলো যাঃ! হতচ্ছাড়া লাউটা, ধরবার আর জায়গা পেলিনে! আর দু'দিন থাক। তোকে না তখন খাচ্ছি....."

কিছু দিন যেতেই লাউটা বেশ নাদুসনুদুস হয়ে উঠে। তা দেখে বুড়ির জিভে জল আসে। ভাবে পোনা মাছ দিয়ে লাউয়ের ঝোল রান্না করে খাবে। যে ভাবনা সে কাজ। বুড়ি লাউটা তুলে নিয়ে আসে। তারপর কুচি কুচি করে কাটে। এবার পেয়াজ লংকা দিয়ে ভালো ভাবে মাখায়। এদিকে উনুনে আগুন জ্বেলে দেয়। তাতে হাঁড়ি চড়িয়ে লাউ ছেড়ে দেয়। রাঁধতে রাঁধতে ঝোলটা যখন 'টগ্বগ্' করে ফুটছে আগুনের আঁচ্ পেয়ে, আগের মতই কে যেন কর্কশ স্বরে বলে উঠে,

"ববগ ববগ মুদিননঅ মাধা খাং!
ববগ ববগ মুদিনঅ মাধা খাং!"

ভয়ে কুকড়ে যায় বুড়ি। এতো সেই আগের গলা। সতীন তার পিছ ছাড়েনি তাহলে। এতো সাক্ষাৎ ডাইনি বৈ অন্য কিছু না। চিন্তায় মাথা খারাপ হবার অবস্থা। ভয়ে তরকারিটা খাবার সাহস হয় না বুড়ির। এই তরকারি খেলে নিশ্চিত মরণ হবে। বুড়ি শুধু তরকারি ফেলে দিয়ে আসে না। মাটির হাঁড়িটাও ফেলে দিয়ে আসে। তারপর হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আবার কয়েকদিন যেতে দেখা গেল, একটা গাছের চারা উঠেছে সেখানে। বট গাছ! দেবতা গোজেন এই গাছের তলায়ই এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছে। তাই গাছটা কাটার সাহস দেখাল না বুড়ি। অল্পদিনেই বেশ বড়সড় হয়ে উঠল সেটা, আর ডাল পালা মেলে দাঁড়িয়ে গেল অনেকখানি জায়গা জুড়ে।

বুড়ি হত্'বিকে দুপুরের কাঠফাটা রোদের মধ্যে ধান ভানতে বলে। বেচারি সৎ মায়ের ভয়ে শত কষ্ট নিয়েই ধান ভানে। তার শরীর

বেয়ে ঘাম ঝড়ে। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ে। তবুও সে কাজ করে। বট গাছটা সে সময় ছায়া দেয় তাকে মায়ের মত পরম স্নেহে। ডালপালা দুলিয়ে হাওয়া করে। মায়ের মতই যেন তার সব ক্লান্তি মুছে দেয় নিবিড় স্নেহে।

হঅ্'বিকে শত কষ্ট দিয়েও বুড়ির মনে শান্তি মিলে না। সতীনের মেয়েকে কষ্ট দেবার চিন্তায় রইল শয়তান বুড়ি। এদিকে বুড়ির হঠাৎ করেই এক অসুখে ধরল। হাড় ভাঙ্গা-চাড়া ভাঙ্গা অসুখ। সে কী যন্ত্রণা! কিছুতেই যেন যন্ত্রণা কমে না।

শেষে বুড়ির এই অবস্থা দেখে বুড়ো যায় এক বৈদ্যের কাছে। বৈদ্য রোগের বর্ণনা শুনে মাথা নাড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়োকে বলে, "এ তো খুব খারাপ এক ব্যামো। ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। এ ব্যামোর এক মাত্র ঔষধ বাঘের দুধ। কিন্তু বাঘের দুধ কে আনবে? তাই সুস্থ হওয়ার কোন সুযোগ নেই।"

বুড়ি হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বৈদ্যের বলা সব কথা বুড়িকে বলে। কিন্তু গভীর জঙ্গল হতে বাঘের দুধ কে আনবে বুড়ির জন্য? কিন্তু মনে মনে এক ফন্দি আঁটে। হঅ্'বি আর ধঅ্'বি সন্ধ্যা বেলা বাঘের দুধ আনতে যাবে। বুড়োর সাথে এ ব্যাপারে কোন রা করে না।

এদিকে দুপুর বেলা বুড়ি নিজের মেয়ে ধঅ্'বিকে বেশ কিছু দুষ্ট বুদ্ধি শিখিয়ে দিল। প্রথম দিকে হঅ্'বির সাথে ধঅ্'বি ভালো ব্যবহার করলেও দিন দিন মায়ের পথে এগুচ্ছে সে। তাই মা কোন কথা বললে তা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। বুড়ি তার মেয়েকে বলল, "আজ বিকালে বাঘের দুধ আনতে যাবার সময় সিঁড়ি হতে পা পিছলে তুই নিচে পড়ে যাবি এবং কোমরে ব্যথা পাওয়ার ভান করবি। তুই যেতে না পারলে হঅ্'বির একাই বনে গিয়ে বাঘের দুধ আনতে হবে। দেখি সে এই কম্য কিভাবে সাধন করে। দুধ আনতে পারলেতো ভালোই, আমার ব্যামো সাড়বে। আর না আনতে পারলে বাঘের পেটে যাবে।"

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়। তারপর বিকালের রোদ পরে সন্ধ্যাও ঘনিয়ে আসে। এদিকে হত্'বির চোঁখে মুখে সন্ধ্যার সাথে সাথে আঁধার দেখা দিল। বুড়ি হত্'বি আর ধত্'বিকে গিয়ে বাঘের দুধ আনার জন্য বলল। এ কথা শুনে থ বনে গেল হত্'বি। বাঘের দুধ, এ-তো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু সৎ মায়ের আদেশ অমান্য করবে এ সাহস তার নেই।

শেষে দুই সৎবোন মিলে বাঘের দুধ আনতে অন্ধকার বনের মধ্যে রওনা হল। সময় যাবার সাথে সাথে অন্ধকারও বাড়তে থাকল। এদিকে বুড়ির কথামত ধত্'বি মাচাঘরের সাঙু (সিঁড়ি) দিয়ে নামার সময় আছাড় খাওয়ার ভান করে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর চেচিয়ে উঠল, "ওমা, মরে গেলাম গো, আমার কোমড় গেল গো, কী ব্যথা! কী ব্যথা!"

হত্'বি তার সৎ বোনের অভিনয় বুঝতে পারে। কিন্তু সৎ মায়ের ভয়ে কিছু বলতেও পারে না। ফলে তাকে একাই বনে যেতে হয় বাঘের দুধ আনার জন্য। হত্'বি একাকী গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। হঠাৎ একটা নেকড়ে ডেকে উঠল। সে ডাক শুনে হত্'বির গা কেঁপে উঠে ভয়ে। মাঝে মাঝে গাছ থেকে হুতুম পেঁচার ডাক ভেসে আসতে লাগল। কখনো আবার নাম না জানা প্রাণির গড়গড় শব্দ। এসব শব্দ শুনে মনে মনে সে ভাবল বনের বাঘ ভালুকেরা আজ তাকে নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলবে। তার আর বাড়ি ফেরা হবে না। কিন্তু সে থামে না। ধীরে ধীরে আরো গহীনে প্রবেশ করে। আর জপ করতে থাকে মাহ লখি মা'র নাম। কিন্তু মাহ লখি মা যেন তার ডাক শুনল না। হঠাৎ তার সামনে পড়ে গেল বিরাট বড় এক বাঘিনী। বাঘিনীর থাবাগুলো দেখে গলার জল শুকিয়ে গেল হত্'বির। তাকে দেখতে বাঘিনী বন কাঁপিয়ে এক হুংকার ছুড়লো। তারপর তেড়ে আসলো তাকে খেতে। তা দেখে হত্'বি করজোড় করে বলল,

"জু! মুঝি! জু!
খেলে খা, দেলে ধা

খেলে, তর অ ভুক জুরেব
মর অ দুক ফুরেব।"

বাংলাঃ

পেন্নাম হই মাসি! পেন্নাম!
খাও অথবা পালাও, যা খুশি চাও।
খাও তো তোমার বুক জুড়োবে,
আমারও দুঃখ ফুরোবে।

হত্'বির কথা শুনে বাঘিনী থেমে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল হত্'বির দিকে। তার চুপসে যাওয়া চেহারা দেখে বাঘিনীর মনে দয়া হলো। মানুষের ভাষায় বাঘিনী বলল, "ভাগ্যিস মাসি বলে ডেকেছিস! নইলে এতোক্ষণে তোকে খেয়ে ফেলেছিলাম আর কি? তা কাদের বাছারে তুই? আ-হা-হা! মুখখানা শুকিয়ে যেন আমসি হয়ে গেছে।"

"মাসি!" হত্'বি বলল, "আমার সৎমার 'হাড়ভাঙ্গা চাড়াভাঙা' ব্যামো হয়েছে। ভারী শক্ত ব্যামো। খানিকটা বাঘের দুধ চাই তার ঔষুধের জন্যে। নইলে আর বাঁচবেনা। এদিকে আমি দুধ না নিয়ে গেলে নিজে মরার আগে আমাকে মারবে।"

"ওমা! তাই নাকি?" বাঘিনী বলল সদয় হয়ে, "তা নে বাছা! নে! মাসি বলে যখন ডেকেছিস, তখন তোকে না দিয়ে কি আর পারি? বিশেষ করে ঔষধের জন্যে যখন বলছিস।"

একটুখানি পা ফাঁক করে দাঁড়াতে বাঘিনীর স্তন থেকে দুধ ঝড়তে থাকল মাটিতে। হত্'বি কাল বিলম্ব না করে একটা বাশের পাত্রের মাঝে খানিকটা দুধ নিয়ে নিলো। এবার প্রাণভরে বাঘিনীকে ধন্যবাদ জানালো সে। তারপর ফিরতি পথ ধরতেই বাঘিনী ফের বলল তাকে, "আহা! তোকে দেখে মনে হচ্ছে, ভারী দুঃখী মেয়ে তুই! দাঁড়া, আমার কাছে মেলাই কাপড় চোপড় রয়েছে। দিয়ে দিচ্ছি তোকে, নিয়ে যা। সেসব পরবি আর তোর এই বাঘিনী মাসিকে মনে করবি, কেমন?"

সেই অতিকাল থেকে কত মানুষ বাঘিনীর পেটে গেছে, তাদের সব রকমারী পোষাক আশাক স্তুপ হয়ে পড়ে আছে একধারে। হথ্'বিকে সেখানে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দিল বাঘিনী। এতোসব সুন্দর কাপড় চোপড় দেখে তার চোখ ছানাবড়া। এতো দামি দামি কাপড় চোপড় রাজা বাদশাহরা পড়ে। ওসব কাপড় ছুঁয়ে দেখবে এ কল্পনাও কোনদিন সে করেনি। কিন্তু সমস্যা বাধে অন্য জায়গায়। অতসব কাপড়ের পাহাড় তার মত বাচ্চা মেয়ে কী আর একেলা একেলা বয়ে নিতে পারে?

তাই সে বেছে বেছে কয়েক জোড়া রেশমের তৈরী সুন্দর পিনোন আর খাদি বের করল স্তুপ থেকে। এবার বেঁধে নিল পুটলী করে, আর বাকিগুলি পড়ে রইল সেখানে। বাঘিনী মাসির কাছে বিদেয় নিয়ে হথ্'বি ফিরে চলল বাড়িতে। এক হাতে বাঘের দুধ আরেক হাতে কাপড়ের পুটলী। বাঘিনী তাকে উপহার দিবে তা ভাবেনি। খুশি মনে পথ চলছে সে, হঠাৎ একটা ভাবনা এসে গেল তার মনে, সব নিয়ে বাড়ি গেলে তার সৎমা না আবার সব কেড়ে কুড়ে নেয়। ভাবনাটা মাথায় আসতেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। চট করে অমনি একটা বুদ্ধি খেলে গেল যায় তার মাথায়। বুদ্ধিটা মাথায় আসতেই সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

ভোরের আলো ফুটবার আগেই হথ্'বি পৌঁছে গেল তাদের গাঁয়ে, বাড়িতে ঢোকার আগে সে গিয়ে হাজির হল ঢেঁকীশালে বট গাছটার কাছে। হাত জোর করে বটগাছটাকে সে বলল "দোহাই তোমার! তুমি যদি সত্যিকারের বট গাছ হও তবে ফাঁক হয়ে যাও।

হথ্'বির কথা শুনে বট গাছটা ফাঁক হয়ে গেল। এমন কিছু ঘটবে সে তা আগেই বুঝেছিল। তাই স্বস্তি নিয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। পূর্বপরিকল্পনা মতো তাড়াতাড়ি কাপড়ের পুটলিটা গাছের ফাঁকাতে রেখে দিল। আর তারপরেই গাছটা আগের মতো হয়ে গেল। এবার দুধের পাত্রটা নিয়ে সে বাড়ির পথ ধরল।

এদিকে রাতে হথ্'বি বাড়িতে না ফেরায় হথ্'বির বুড়ো বাপ কান্নাকাটি করে চোখ লাল করে ফেলল। বুড়োর কান্না দেখে বুড়ির

কী খুশি! বুড়ি মনে মনে বলল, "ভালো হয়েছে আপদ বাড়ি থেকে বিদায় হয়েছে"। আবার বুড়োর কান্না দেখে বুড়িও নাকি সুরে কান্নার ভান করল।

কিন্তু সকাল হতেই হঅ্'বিকে জীবিত অবস্থায় ফিরতে দেখে সৎমা বুড়ি রেগে আগুন হয়ে গেল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "পাজি মেয়ে। হতচ্ছাড়ি কোথাকার। গতরাত্রে কোথায় গিয়েছিলি? নিশ্চয়ই বনে যাসনি? কারোর বাড়িতে গল্পগুজব করে ফিরলি। তোর সাহস তো কম না।"

কিন্তু হঅ্'বি যখন সত্যি সত্যি বাঘের দুধ তার হাতে দিল তখন শয়তান বুড়ি মনের রাগ মনে চেপে চুপসে গেল। এই অসম্ভব কাজ সে কিভাবে করল? যা-ই হোক, যেভাবেই করুক, তার ব্যামোর তো একটা ব্যবস্থা হবে, এই ভেবে একটু শান্ত হয়। আর ওদিকে বুড়ো বাপ তার মেয়ে ফিরে আসায় খুব খুশি হলো। বুকে জড়িয়ে নিলো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তাকে খুব আদর করল।

শয়তান বুড়ি কিন্তু হঅ্'বিকে ছাড়ল না সহজে। কিছুদিন পর আবার বুড়িকে সেই হারভাঙ্গা চাড়াভাঙ্গা রোগে ধরল। বুড়ো আবার গেল বৈদ্যর কাছে। সব শুনে বৈদ্য বলল, "এবারের ঔষধ হল সাপের দুধ। সাপের দুধই পারে বুড়িকে সাড়িয়ে তুলতে।"

বুড়ো বাড়ি ফিরে আসল। এসে বুড়িকে জানালো ঔষধের কথা। বুড়ির মাথায় আবারো দুষ্টু বুদ্ধি ভর করে। ধঅ্'বি আর হঅ্'বিকে পাঠানো হয় সাপের দুধ আনার জন্যে। মায়ের কথা মতো এবারও ধঅ্'বি মাচা ঘরের সাঙুতে আছাড় খেল। তারপর গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করল। বোনের অভিনয় দেখে হঅ্'বি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর একাই বনের দিকে পা বাড়াল সাপের দুধ আনার জন্য।

এবার কিন্তু বনের মধ্যে চলার সময় অতো ভয় পেল না। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগল কিভাবে সাপের কাছ থেকে দুধ নেয়া যায়। হঅ্'বি বনের গহীনে পৌঁছাতেই একটা বিরাট সাপকে দেখতে পায়। সাপটা কুন্ডুলি পাকিয়ে ঝিমুচ্ছে। সাপটাকে দেখে হঅ্'বির মুখ

হা হয়ে যায়। তবুও সাহস নিয়ে পেছন থেকে পিসি ডেকে প্রণাম করল। তারপর খুলে বলল সব কথা।

সব কথা শুনে সাপটার মনে দয়া হলো। হত্র'বিকে এক চুংগা দুধ দিতে দিল। তারপর হত্র'বির ক্লান্তিমাখা বদনখানির দিকে তাকিয়ে সাপটা বলল, "তোকে দেখে খুব দুঃখী বলে মনে হচ্ছে। দাঁড়া, আমার কাছে মানুষের গয়না পত্তর মেলাই পড়ে আছে। তোকে দিচ্ছি, নিয়ে যা। সে সব পড়বি আর তোর এই বনের পিসিকে মনে করবি, কেমন?"

সেই আদ্যকাল থেকে কত মানুষ গিলে খেয়েছে সাপটা, তাদের হাড়গোড় সব কবে হজম হয়ে গেছে তার পেটে। কিন্তু গয়নাগুলো তো আর হজম হয় না! সেগুলো সব উপরে উপরে রেখে দিয়েছে এক জায়গাতে। হত্র'বিকে সেই জায়গাতে নিয়ে গিয়ে সব গহনা দেখিয়ে দিল সাপটা। ভাঁড়া বোঝাই গহনা দেখে তো হত্র'বির আক্কেলগুড়ুম অবস্থা। হত্র'বির সাধ্যি কিসে সব একা বয়ে নিয়ে আসে! বুদ্ধি করে কিছু হিরে জহরতে মোড়ানো গহনা আলাদা করল। তারপর পুটলির মধ্যে ভালো করে বাঁধল। এবার গহনার পুটলি আর দুধের চোংগা নিয়ে বাড়ির পথ ধরল। আজ কিন্তু বাড়ি ফিরতে আরো বেশি দেরি হয়ে গেল। রাত পেরিয়ে দিনেরও অর্ধেকটা পেরিয়ে গেল। পুরো বন তার এখন আর ভয়ংকর মনে হয় না। ঘুরে ঘুরে নানারকম গাছগাছালি দেখল। সেগুলোর সাথে কথা বলল। ফলমূল খেল। একটা কাঠবিড়ালির ছানার সাথে কিছুক্ষণ খেলল। তারপর আবার গাঁয়ের দিকে এগুলো।

সাঁঝের সময় সে গাঁয়ে পৌঁছাল। কিন্তু প্রথমেই বাড়িতে গেল না। পুটলি নিয়ে বট গাছটার কাছে গেল। পূর্বের মতো বলতেই গাছটা ফাঁক হয়ে গেল। তারপর সেখানে রেখে দিল গহনার পুটলিটা। এবার শান্তভাবে সাপের দুধটা বাড়িতে নিয়ে দিয়ে দিল তার বাপের হাতে।

দু'বারের মত হত্র'বিকে জ্যান্ত ফিরে আসতে দেখে বুড়ি তো চটে মটে লাল ভেতরে ভেতরে, "সতীনের মেয়েটা কিছুতেই যেন মরতে

জানে না, এমনি আপদ জুটেছে! বাসায় থেকে থেকে এই আপদটা শুধু অন্ন ধ্বংস করছে!" ভাবনাটা মাথার মধ্যেই রেখে দিল বুড়ি, মুখে তো আর কিছু বলার জো নেই, পাছে না বুড়ো সব টের পেয়ে যায়!

এমনি করে দুঃখ পেয়ে পেয়ে বুড়োর মেয়েটা বড় সড় হয়ে উঠল কালে কালে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে চেহারার লাবন্যও বৃদ্ধি পেতে লাগল। চোখগুলো হলো একেবারে হরিণের মতো। কিন্তু দেখতে ভাল হলে কী হবে? একটা ভাল কাপড় পড়তে দেয় না বুড়ি তাকে। মাথার চুলে তেল পড়ে না কোন কালে। হাত কিংবা পা, কোনখানেই তো তার গহনা পড়া হয় না। সারাদিন বুড়ি তাকে শুধু খাটিয়েই মারে, আর উঠতে বসতে গাল মন্দ করে। মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে, অথচ বুড়ি পড়তে দিলনা তাকে কোনদিন একজোড়া পায়ের খাড়ু, কি এক জোড়া হাতের বালা। ওদিকে নিজের মেয়েটার বেলায় কিন্তু সাজ পোশাকের কোন কমতি নেই। গহনা দিয়ে না পারে পুরো মুড়িয়ে রাখে মেয়েকে। কাজকর্ম কিছুই করতে হয় না বুড়ির মেয়েটাকে। মায়ের মতো সে-ও হঅ্'বিকে দিয়ে শুধু খাটায়। সে নিজে খায়, দায় আর ফুর্তি করে বেড়ায় সেজে গুঁজে।

এভাবে বহুকাল কেটে যায়। জীবন চলতে থাকে জীবনের গতিতে। হঠাতই একদিন গায়ের বাজারে রাজার লোক আসে। ঢেড়া পিটায়। সবাই সেখানে হাজির হয়। এবার রাজার লোক ঘোষণা দেয় রাজপুত্রের বিয়ের। দেশে বিদেশে যত কুমারী মেয়ে আছে সবাইকে রাজ দরবারে আমন্ত্রণ জানায়। রাজার ছেলের যাকে পছন্দ হবে তার কপাল খুলে যাবে। সে হবে রাজবধু। পুরো গায়ে যেন ধুম লেগে যায় এ খবর শোনার পর।

গায়ের প্রতিটা মেয়ের মনেই বইতে থাকে রাজবধু হবার সুপ্ত বাসনা। কে বা না চাইবে রাজপুত্রকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে সংসার করতে। প্রত্যেকেই নিজের রূপ লাবণ্য বাড়াবার জন্য নানারকম রূপচর্চা শুরু করে। নানারকম ভেষজ মলম লাগাতে থাকে মুখের মাঝে। চুলের পরিচর্যারও কমতি রাখেনি কেউ। সবাই সবার মতো করে প্রস্তুতি নিয়ে রাজদরবারের উদ্দেশ্যে ছুটতে

থাকে। কে কার আগে সাজিয়ে গুছিয়ে মেয়েকে রাজবাড়ি পাঠাবে তার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এদিকে শয়তান বুড়িও ধঅ্'বিকে রাজবাড়ি পাঠানোর জন্য আত্মীয় কুটুমের কাছ থেকে নানারকম গয়নাগাটি চেয়ে আনল। তারপর নির্দিষ্ট দিনে ধঅ্'বিকে ঘোড়ার গাড়িতে করে রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিল। সাথে অবশ্য সতীনের মেয়েকেও পাঠিয়ে দিল চাকরানী হিসেবে।

গাড়িতে উঠার আগে অবশ্য শয়তান বুড়ি নিজের মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিল, "তোর সৎবোনকে লোকের কাছে চাকরানী বলে পরিচয় দিবি।" এরপর হঅ্'বি আর ধঅ্'বি দুজনকে দু'গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিল। কদ্দুর যাবার পরই হঅ্'বির গাড়িতে সমস্যা দেখা দেয়। চালক জানায় সাড়াতে সময় লাগবে। তখন ধঅ্'বি হঅ্'বিকে নিজের গাড়িতে তুলে নিয়েই, রাজ দরবারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায়। আসলে হঅ্'বির গাড়িটা খারাপ হওয়াতে ধঅ্'বি আহ্লাদে আটখানা।

এর অবশ্য কারণ আছে। হঅ্'বিকে যতই খারাপ অবস্থায় রাখা হোক না কেন, রূপে গুনে পুরো গায়ের মধ্যে তার মতো আর একজনও ছিল না। মাঝে মাঝে পাশের বাড়ির মাসি পিসিরা এই নিয়ে আলাপও করত। তাই হঅ্'বিকে হিংসে করত ধঅ্'বি। কিন্তু এতে একটুও মন খারাপ করল না হঅ্'বি। ধঅ্'বির গাড়িটা চোঁখের আড়ালে চলে গেলে হঅ্'বি আস্তে করে নামল। নেমে সেই বট গাছটার কাছে হাজির হল।

বট গাছটার কাছ থেকে সোনার জড়োয়া গয়না আর সুন্দর সুন্দর রেশমের পোশাক চেয়ে নিল। সে চাইতেই বটগাছটা ফাঁক হয়ে গেল। পুটলির ভিতর থেকে পছন্দের গহনা আর ভালো ভালো পোশাক বের করল। তারপর গাছটাকে নির্দেশ দিতেই সেইটা পূর্বের মতো হয়ে গেল। এবার কাপড় আর গহনাগুলো পড়ে সুন্দর ভাবে সেজে রাজবাড়ির দিকে রওনা হলো। হঅ্'বির এমনিতে ফুটফুটে গায়ের রঙ, লম্বা লম্বা চুল, হরিণ কালো দু'চোখ, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট, সোনার জড়োয়া গয়না আর ঝলমলে রেশমের কাপড় পড়ে তাকে পরী কন্যার মত সুন্দর লাগছিল। তার দিকে যে

তাকায় আর চোঁখ ফেরাতে পারে না। হত্'বি যখন রাজবাড়িতে পৌঁছাল সেখানেও একই অবস্থা। রাজবাড়ির বাদ্য-বাজনা, নাচগান নিমিষেই থেমে গেল।

কারণ সকলে সব ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এমন সুন্দরী কন্যা কেউ জীবনে দেখেনি। ও কী মানুষ না পরী! মুহূর্তের মধ্যে সারা রাজবাড়িতে খবর রটে গেল, এক অসম্ভব সুন্দরী কন্যা এসেছে স্বর্গ থেকে। তার চেহারা থেকে লাবণ্য নিংড়ে পড়ছে। যে একবার দেখছে সে আর চোখ ফেরাতে পারছে না। এই স্বর্গ কন্যাকে এক নজর দেখার জন্য সকলের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। খবর পেয়ে কুমারও চলে আসল।

হত্'বির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে কুমারও মুগ্ধ হয়ে গেল। রাজকুমারের চোখে চোখ পড়াতে হত্'বি লজ্জায় মাথা নিচু করল। লজ্জায় তার গালদুটি আরো লাল হয়ে গেল।

এতে তার সৌন্দর্য বেড়ে গেল বহুগুণ। কুমার খুশি হয়ে হত্'বির হাত ধরে নাচতে লাগল। আর চিৎকার করে বলতে লাগল, "আমি আমার মনের রাণী পেয়ে গেছি বাবা, আমি আমার মনের রাণী পেয়ে গেছি বাবা। আমি এই মেয়েকেই বিয়ে করতে চাই। এই মেয়েকে ছাড়া আমার জীবন বৃথা।" মুহূর্তের মধ্যে সকলের কাছে খবর পৌঁছে গেল রাজকুমার বিয়ের জন্য মেয়ে পছন্দ করে ফেলেছে।

এদিকে ধত্'বি প্রথমে তার সৎ বোনকে এরকম দামি গহনা আর কাপড়ের কারণে চিনতে না পারলেও পরে ঠিকই বুঝতে পারল এইটা তার সৎবোন হত্'বি ছাড়া অন্য কেউ না। তখন হিংসায় জ্বলে পুড়তে লাগল। রাজকুমার হত্'বিকে ছাড়তে নারাজ। তাই হত্'বিকে আদর যত্ন করে রাজবাড়ির অতিথিশালায় রাখা হলো।

এর কিছু দিনের মধ্যেই মহাধুমধাম করে কুমারের সাথে হত্'বির বিয়ে হলো। সারা রাজ্যের লোক আনন্দ উৎসবে মেতে উঠল। সাত

দিন সাত রাত ধরে রাজবাড়িতে খানাপিনা আর গানবাজনা চলল। রাজ্যের প্রজাদের কয়েক বছরের খাজনা মওকুফ করে দেয়া হলো। গরীব প্রজাদের মধ্যে অর্থ বস্ত্র বিতরণ করা হলো। দূর দূর দেশ থেকে অতিথি আসল এই বিয়ে দেখার জন্য। মোট কথা রাজা নিজের একমাত্র পুত্রের বিয়েতে কোন কিছুর কমতি রাখেননি।

এসব দেখে তো ধঅ্'বির আর চোখের জল বাঁধ মানে না। সে কেঁদে কেঁদে বিছানা ভিজিয়ে ফেলল। হিংসায় জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে লাগল। নাওয়া খাওয়া বন্ধ করে দিল। শেষে দুষ্ট বুড়ি ধঅ্'বিকে আবার কূটবুদ্ধি দিতে লাগল, "কাঁদিসনে, ঐ শত্তুর যখন কুমারকে নিয়ে বাপের বাড়ি আসবে, তখন সুযোগ বুঝে তাকে মেরে ফেলব। তখনই তুই হঅ্'বি সেজে রাজবাড়িতে যাবি। তুই ছাড়া রাজকুমারের বউ হবার যোগ্যতা যে আর কারো নেই। শয়তান বুড়ি আর তার মেয়ে মিলে ফন্দি আটতে লাগল কিভাবে হঅ্'বিকে মেরে ফেলবে।

তাদের বেশিদিন অপেক্ষা করা লাগল না। সে সুযোগও মিলে গেল অল্পদিনের মধ্যেই। বাপকে ছেড়ে থাকতে পারছিল না হঅ্'বি। তাই একদিন হঅ্'বি সত্যি সত্যিই তার স্বামীকে নিয়ে বুড়ো বাপের বাড়িতে এলো। সাথে হাতি-ঘোড়া, দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত, কতজনই না এলো! সাথে অনেক অনেক বহু-মূল্যবান উপহারও এলো।

এতোদিন মেয়েকে কাছে পাবার জন্য বাপের মন মানছিল না। বারবার মনে হচ্ছিল রাজবাড়ি গিয়ে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসে। কিন্তু আজ হঠাৎ মেয়ে আর মেয়ের জামাইয়ের তার বাড়িতে আসার কথা শুনে বুড়ো বাপের আনন্দ আর ধরে না। বুড়ো নিজে গিয়ে রাজকুমার জামাইকে রাস্তা থেকে মহাসমাদরে বাড়িতে নিয়ে এলো। হঅ্'বি বাপকে পেয়েই কান্না জুড়ে দিল। বাপ পরম মমতায় মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। এবার হঅ্'বিকে আর পায় কে। তার চাল চলন, কথা বার্তাতেও বেশ পরিবর্তন এসেছে। এখন সে বুক ফুলিয়ে পুরো বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়।

এদিকে সতীনের মেয়ের সৌভাগ্য দেখে শয়তান বুড়ির বুকের হিংসায় জ্বলতে থাকে। রাজকুমারকে রাজবাড়ী দেখে রাজবাড়ীর তার পাশে নিজের মেয়েকে কল্পনা করতে থাকে। তবে বুড়ি খুবই চালাক, সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। মনের মধ্যে হিংসা লুকিয়ে রাখে ঠিকই, তবে উপরে উপরে জামাইকে খুব যত্ন করতে লাগল। খাবার দাবার রান্না করল, মাছের বড় মাথাটি জামাইয়ের পাতে জোর করে তুলে দিল। কখন কী লাগবে সে খবর রাখল। আর নিজেকে সুখুবির সতিনকাজের মা বলে পরিচয় দিল।

সুখুবির প্রতিও তার সংসারের আদর যত্ন বেড়ে গেল বহুগুণ। এখন মা ছাড়া তাকে ডাকই দেয় না বুড়ি। এভাবেই বাপের বাড়িতে কেটে গেল বেশ কিছু দিন। কিন্তু কুমার তো সারাজীবন শ্বশুর বাড়িতে থাকবে না। রাজ্যের মধ্যে কত কাজ আছে। দিন কতক পর কুমার ফিরে যেতে চাইল। আর তাতেই সুখুবির হলো মন খারাপ। আসলে অনেক দিন পর বুড়ো বাপকে পেয়ে আবার ফেলে যেতে মন কিছুতেই চাইছিল না তার। শয়তান বুড়িও সে সুযোগ ছাড়ল না। সেও সুখুবিকে আরো কিছুদিন থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সবাইকে দেখাতে লাগল সুখুবিকে সেও কতই না ভালবাসে। তাকে ছাড়তে বুড়িরও কষ্ট হচ্ছে। মেয়েকে ছেড়ে কি মা থাকতে পারে! বুড়ির অভিনয় কিছুটা আঁচ করতে পারলেও সুখুবি কিছুই বলল না। সুখুবির ইচ্ছে বুঝে কুমার তাকে আরো কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়িতে রেখে রাজপুরীতে ফিরে গেলেন। কুমারের প্রতি সুখুবির ভালোবাসার অন্ত নেই। তাই স্বামীর যাতে সামান্য অসুবিধা না হয় সে লক্ষ্যে সেবার জন্য সব দাসদাসীদেরও রাজবাড়িতে পাঠিয়ে দিল।

এবার শয়তান বুড়ি আর তার কিংসুটে মেয়ে সুখুবির আসল রূপ বেরিয়ে আসল। সুখুবিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবার জন্য বিভিন্ন পন্থা খুঁজতে লাগল। মুখে অবশ্য সুখুবির সাথে মিষ্টি মিষ্টি ভাব দেখাতে লাগল, কারণ এখন সুখুবি রাজকুমার-পত্নী। তাকে সরাসরি কিছু করলে রাজকুমার বুড়িকে ছাড়বে না।

হত্র'বির ছিল বেইন বোনার শখ। সে প্রতিদিন দুপুরেরর খাবারের পর বেইন বুনতো। সুযোগ বুঝে শয়তান বুড়ি আর তার হিংসুটে মেয়ে বেইন ঘরের পেছনে একটা মস্ত বড় গর্ত খুড়ে ফেলল। একদিন দুপুরে হত্র'বি বেইন বুনছিল আর ধত্র'বি পাশে বসে তা দেখছিল। মাঝে মাঝে হত্র'বির শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞেস করছিল ধত্র'বি। এটা সেটা জিজ্ঞেস করার ছলে ধত্র'বি জিজ্ঞেস করল হত্র'বিকে, "আচ্ছা দিদি, তোর তো বিয়ে হয়েছে মেলাদিন, অথচ তোর বিয়ের আংটি এখনও ভাল করে দেখাই হলো না। বড্ড ইচ্ছে করছে হাতে নিয়ে দেখতে। দেখতে দিবি একটুখানি?" হত্র'বি বোনের কথা শুনে তাতে সন্দেহের আঁচও পেল না। কেননা বিয়ের পর যখন বাপের বাড়ি ফিরেছে তখন তার সাথে একবারের জন্যেও খারাপ ব্যবহার করেনি। তাই বোনের আবদার ফেলতে পারল না। সহজ সরল মনে বিয়ের আংটিটি খুলে বোনের হাতে দিয়ে বলল, "ভাল করে দেখ, হারিয়ে ফেলিস না যেন।"

ধত্র'বি আংটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল, "ইশ! কি সুন্দর আংটিরে দিদি! এমন সুন্দর আংটি যদি আমার থাকত!" ধত্র'বির কথা শুনে হত্র'বি মুচকি হেসে বলল, "দেখিস তোর এক রাজপুত্তুরের সাথে বিয়ে হবে। তোকেও এমন আংটি দিয়ে বিয়ে করবে সে।" ধত্র'বি শুধু মাথা নাড়ল। তারপর আবারও আংটিটার দিকে নজর দিল। হঠাৎ ইচ্ছে করেই আংটিটা গর্তের মধ্যে টুক করে ফেলে দিল।

তারপর হায় হায় করে উঠল ধত্র'বি, "কি হবে রে দিদি, আংটিটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেছে। এখন তোর বরতো তোর সাথে রাগ করে কথাই বলবে না।" হত্র'বি ভয় পেয়ে গেল, রাজকুমারকে সে খুব ভালোবাসে। কোন ভাবেই তাকে হারাতে চায় না। দুশ্চিন্তায় তার মাথা কাজ করছিল না। তার উপর হত্র'বি ছিল সাদাসিধে ধরণের। শয়তান বুড়ি আর তার মেয়ের কুবুদ্ধি ধরতেই পারল না। উপায়ন্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বিয়ের আংটিটা আনার জন্য গর্তের মধ্যে সে নিজেই নেমে পড়ল। শয়তান বুড়ি আর ধত্র'বি এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। যেই না হত্র'বি গর্তে নেমে পড়ল, অমনি দুজনে

দুদিক থেকে মাটি চাপা দিতে শুরু করল। হজ্'বি আর উপরে উঠে আসতে পারল না। দমবন্ধ হয়ে সেখানেই মারা গেল।

হজ্'বি মারা গেল ঠিকই কিন্তু তার আত্মা স্বর্গে গেল না। সেইটা ঢুকে গেল একটা হলদে পাখির মাঝে। এবার সে হলদে পাখি হয়ে রাজবাড়ির দিকে উড়ে যেতে লাগল আর ভাবতে লাগল, "কুকুরের লেজ কখনো সোজা হয়না।"

মাটি চাপা দেয়া শেষ হতেই শয়তান বুড়ি আর তার মেয়ে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল নিশ্চিত হবার জন্য যে ধজ্'বি মরেছে। যখন মনে হলো এখন আর বেঁচে থাকার কোন সুযোগ নেই তখন জবাব মাটি সড়াতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ধজ্'বির মৃতদেহটা বেরিয়ে আসল। মৃত দেহ থেকে আংটিটা আর অলংকারগুলো খুলে নিল মা মেয়ে মিলে। আংটিটা হাতে আসতেই ধজ্'বি হা হা করে এক পৈশাচিক হাসি দিল, "ঠিকই বলেচিস রে দিদি, আমাকেও রাজপুত্তুর নিয়ে যাবে, তবে সেইটা অন্য রাজপুত্তুর না, তোর স্বামীই।"

এ ঘটনার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। কয়েকদিন সবুর করার পর হজ্'বি ধজ্'বির আংটি আর অলংকার পড়ে হজ্'বি সেজে রাজবাড়ির দিকে রওনা হলো। তাকে দেখে কুমারের মনে প্রথম থেকেই সন্দেহ দেখা দিল। কারণ হজ্'বির চালচলনের সাথে ধজ্'বির চালচলনের মধ্যে অনেক বেশিই তফাত। তাছাড়া হজ্'বিতো অনেক বেশি রূপবতী ছিল। চাঁদের আলোর মতো যেন চুইয়ে চুইয়ে পড়ত সে রূপ। গায়ের বরন ছিল দুধে আলতা। কিন্তু এই মেয়ের গায়ের রঙ অনেক কালো। হাসির মাঝেও কোন প্রাণ নেই। কেমন বিশ্রী করে হাসে। তার গালও এতো ফোলা ফোলা ছিল না। গলার স্বর কি মধুর ছিল! তাই কুমার তো তাকে কিছুতেই নিজের স্ত্রী বলে মেনে নিতে রাজি হলো না, বলল, "তুমি কে সত্যি করে বল তো? আমার হজ্'বি তুমি নও। আমার হজ্'বির গলার স্বর এমন কর্কশ না। তার গালগুলোও এমন ফোলা ফোলা না।"

তখন ধত্'বি বুক চাপরে বিলাপ জুড়ে দিল। কান্নামাখা মুখ নিয়ে বলল, "কুমার, তুমি আসার পর তোমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমার চোখ ফুলে গেছে। গাল ফোলা ফোলা হয়ে গেছে। গলার স্বর ভেঙে গেছে। দুঃখে আমার দুধে আলতা গায়ের রঙও কালো হয়ে গেছে। আর তুমি আমাকে সন্দেহ করছ? আমার ভালোবাসার তুমি এই প্রতিদান দিচ্ছ?" কিন্তু কুমার মানতে নারাজ। কোন ভাবেই এইটা তাঁর স্ত্রী হতে পারে না। এবার ধত্'বি তার মোক্ষম চালটা চালল। বিয়ের আংটি কুমারকে দেখিয়ে বলল, 'কুমার এই দেখো, আমার হাতে এখনো তোমার পরিয়ে দেয়া আংটি আছে। তুমি নিজ হাতেই তো এই আংটিটা পড়িয়ে দিয়েছিলে। এরপরেও তুমি আমাকে অবিশ্বাস করবে?"

কুমার ধত্'বির হাতের আংটি দেখে অবাক হয়ে গেল। এই আংটি দিয়ে তো সে হত্'বিকে বিয়ে করছিল। তবুও কিন্তু তার মন থেকে সন্দেহ দূর হলো না। যা হোক, কুমার ধত্'বিকে রাজবাড়িতে থাকতে দিল। কিন্তু এতো সহজেই ছেড়ে দিল না। ধত্'বিকে নানাভাবে পরীক্ষা করার জন্য কিছু বিশ্বস্ত দাসদাসীদের ডেকে পাঠিয়ে হুকুম দিল। আর বলল, এই খবর যেন কাকপক্ষীও না জানে।

ধত্'বি রাজবাড়িতে ঠাঁই পেল। ঠাঁই পেলে কী হবে, তার আসল বিপদ সবে তো শুরু হলো। প্রথম দিন তাকে রাঁধতে দেয়া হলো। কেননা হত্'বি যেমন ছিল অপরূপা তেমনই ছিল গুণবতী। বিয়ে হয়ে রাজবাড়িতে থাকার সময় বিভিন্ন মজাদার পদ তৈরী করে খাইয়েছে রাজকুটুমদের। কিন্তু ধত্'বি তো এসবের কিছুই পারে না। বাড়ির সকল কাজ তার সৎ বোনকে দিয়েই করাত।

তবুও যাতে ধরা না পড়ে যায় তাই উনুনে আগুন জ্বেলে রাঁধতে বসল। কিন্তু রাঁধতে বসে কোনটায় বেশি নুন দেয়। কোনটায় নুন দিতে ভুলে যায়। কোনটায় ঝাল বেশি দেয়। কোনটাতে একেবারেই লংকা দেয় না। সেদিন কেউ তার রান্না মুখে দিতে পারলো না। তখন ধত্'বি নানা অজুহাত দেখাতে লাগল। "আসলে রাজবাড়িতে বৌ হয়ে আসার পর অনেকদিন রান্নাবান্না করিনি। তাই রান্না ভাল

হয় নি।" সে বেমালুম ভুলেই গেল হত্'বি রাজবাড়িতেও রান্না করে খাইয়েছে। কিন্তু কেউ তাকে কিছুই বলল না।

দ্বিতীয় দিন তাকে বলা হলো গান গাইতে। এবারও পড়ল মহা বিপদে। তার গলা অনেক বেশি বেসুরা। তাছাড়া কোনদিন সেভাবে গান গাওয়ার চেষ্টাও সে করেনি। তবুও সম্মান বাঁচানোর জন্য সে গাইতে শুরু করে। আর সাথে সাথেই যেন কক্ষের ভিতর কাঁপন ধরল। সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনে যে যেদিকে পারল পালিয়ে বাঁচল। এতে ধত্'বি ভীষণ লজ্জা পেল। কিন্তু কোন ভাবেই নিজের আসল পরিচয় প্রকাশ করল না। সে নিজের দোষ ঢাকার জন্য বলতে লাগল, "কুমারের বিরহে কাঁদতে কাঁদতে আমার গলার স্বর এমন বেসুরো হয়েছে।" নিজেকে বাঁচানোর জন্য ধত্'বি যতই অজুহাত দেখাক না কেন, রাজবাড়ির সেই বিশ্বস্ত দাসদাসীদের কাছ থেকে সে রেহাই পেল না। তাদের সন্দেহের দানা বাড়তেই লাগল।

এবারে তারা ধত্'বিকে ছবি আঁকার জন্য রংতুলি এনে দিল। কুমার হত্'বিকে নিজ হাতে ছবি আঁকা শিখিয়েছিল। কুমারের মতো অনেক ভালো আঁকতে না পারলেও ছবি আঁকার মৌলিক সকল জ্ঞান তার মধ্যে ছিল। কিন্তু ধত্'বি তো ছবি আঁকার কিচ্ছু জানে না! সে আঁকল কাকের ঠ্যাং, বকের ঠ্যাং। সে ছবি দেখে সবাই নাক সিঁটকায়। কুমার তো ধরেই নিল এটা হত্'বি হতেই পারে না।

শেষে সবাই তাকে বেইন বুনতে দিল। হত্'বি খুব সুন্দর কাপড় বুনত। ভারী সুন্দর সুন্দর ফুল তুলতে পারতো। তা দেখে রাজবাড়ির সকলে কী প্রশংসাই করতো! একটা রুমালও বানিয়ে দিয়েছিল কুমারকে। যেটা যত্ন করে কুমার নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। ধত্'বি জন্মে কোনদিন বেইন বুনেনি। সে পড়ল মহা ফ্যাসাদে। কিভাবে বেইন বুনবে বসে বসে ভাবছে। এমনি সময়ে মাথার উপর থেকে হলদে পাখিটি বলে উঠলো,

"তিনজুর ফেলেই তিনজুরের তুল
ভুদুনি ঝি ভুদুনি

বিগুন বিজি ফুল্ল তুল।

বাংলাঃ

'তিন জোড়া ফেলে তিন জোড়া তুল
ভূতনীর ঝি ভূতনী
বেগুন বিচি ফুলটি তুল"।

হলদে পাখির কথাটা শুনে ধত্'বির রাগ হলো খুব। সে একটা ব'কাঠি পাখিটার দিকে জোরে ছুড়ে মারল। বেচারি হলদে পাখিটা সাথে সাথে মারা গেল।

সেদিন ঐ পথ দিয়ে কুমার শিকারে যাচ্ছিল বনে। পথিমধ্যে কুমার আবিষ্কার করল একটা হলদে পাখিটা মরে পড়ে আছে তার রাস্তায়। তার বড় মায়া হলো। ঘোড়া থেকে নেমে পাখিটার কাছে গেল। পরম মমতা নিয়ে পাখিটা আনল তার শোবার ঘরে। রাখল ঘরের এক কোণে বড় যত্ন করে। পাখিটার কথা ভাবতে ভাবতে কুমার এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরের আলো চোখে পড়তেই কুমারের ঘুম ভাঙে, ঘুম ভাঙতেই কুমারের অবাক দৃষ্টি পড়ল পুরো ঘরে। এ কী অবাক কান্ড! তার ঘরটা সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিয়ে গেছে কে? এসব যখন ভাবছিল তখনই মনে পরে হলদে পাখিটার কথা। সাথে সাথে হলদে পাখিটাকে যে স্থানে যত্ন করেছিল সেদিকে তাকায় আর দেখতে পায়, হলদে পাখিটাকে যেখানে রেখেছিল সে জায়গায় রাতারাতি কোন দিব্য শক্তিতে একটা ছদরক ফুলের (গাঁদা) গাছ উঠেছে। শুধু গাছ জন্মায়নি, তাতে একটা বড় সুন্দর ফুল ফুটে আছে। দেখে শুনে কুমার বড় অবাক হল। ভাবল, এটা কি স্বপ্ন নাকি মনের ভুল!

এরপরদিনও ঘুম থেকে উঠে কুমার দেখল, সে একই কান্ড। গত রাতের মতই তার ঘর সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো। এতে মনে

মনে খানিকটা খুশি হলো কিন্তু মেজাজ খারাপ হলো অন্য এক কারণে। তার পরনের কাপড়ে কে যেন পানের পিক লাগিয়ে দিয়ে গেছে। এতে কুমারের ভীষণ রাগ হলো। রাজবাড়ির সকল দাসদাসীদের ডেকে বলল, তোমাদের মধ্যে কে এই কান্ড করেছ? সকল দাসদাসী তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তারা কেউ কিছু বলতে পারল না, কে এই কাজ করেছে।

কুমার তখন ঠিক করল নিজেই এর সুরাহা করবে। সেদিন রাতে সে ঘুমালো না। ঘুমাবার ভান করে পড়ে রইল। রাত যখন গভীর, তখন কুমার দেখতে পেল, ঘরের কোণের ছদরক ফুল থেকে এক পরমা সুন্দরী কন্যা বের হয়ে আসছে।

কুমার অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল, তার চোখে আর পলক পড়ে না। সুন্দরী মেয়েটি প্রথমে ঘরের জিনিসপত্র সুন্দরভাবে সাজালো। তারপর ভাত রাঁধতে বসল। রাঁধা শেষ হলে, ভাতের অর্ধেক নিজে খেয়ে বাকী অর্ধেক পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখল। এরপর পানের বাটা খুলে পান সাজিয়ে মুখে দিল। পান খেয়ে মুখ টুকটুকে লাল করে ফেলল। তারপরে কুমারের পরনের সাদা কাপড়ে পানের পিক লাগিয়ে দিয়ে আবারো ছদরক ফুলটার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই আশ্চর্য কান্ড দেখে কুমার হতবাক হয়ে রইল। সে পরের রাতের অপেক্ষায় রইল। ঘুমের ভান ধরে বিছানার মধ্যে পরে রইল। যে কেউ দেখলে বলবে ঘুমাচ্ছে। রাত গভীর হবার সাথে সাথে পূর্বের রাতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। একে একে সুন্দরী মেয়েটা ঘর গোছাল, রান্না করল, তারপর একটা পানও খেল। একে একে সব কাজ শেষে সুন্দরী মেয়েটি যখন কুমারের পরনের কাপড়ে পানের পিক লাগাতে গেল, অমনি কুমার লাফিয়ে উঠল। তা দেখে সুন্দরী মেয়েটা গাছের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে নিলে কুমার তার সুন্দর লম্বা চুল ধরে ফেলে। এবার কুমার মোহগ্রস্তের মতো জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি। কী তোমার পরিচয়?" সুন্দরী মেয়েটি প্রত্যুত্তরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর জবাদ দেয়,

"কুমার রে কুমার
লেজত্ ন ধরিচ
পেজত্ ধর"

বাংলাঃ

"কুমার চুলে না ধরে আঁচলে ধর"

মেয়েটি কুমারের কথা মতো চুল ছেড়ে যখনই আঁচল ধরতে যাবে তখনই মেয়েটি এক লাফে ফুলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরের রাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবার আর কুমার ভুল করল না। যেই না মেয়েটি তার কাপড়ে পানের পিক লাগাতে গেল, অমনি কুমার মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে তার আচলে ধরে। সাথে সাথেই জ্যোতি কমে আসে মেয়েটার। আর তাতেই কুমার সেই চিরপরিচিত মুখ চিনতে পারে। এ যে তার প্রেয়সী হত্'বি। হত্'বিও তখন কুমারকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

কাঁদতে কাঁদতে তার সৎমা আর সৎবোনের ষড়যন্ত্রের কথা সব খুলে বলল। শুধু তাই না, ছোট থেকে যত অত্যাচার করেছে, তার হাতেই তার মাকে কিভাবে পুড়িয়ে মেরেছে সব খুলে বলল। সব শুনে প্রচন্ড রাগ হলো কুমারের, এদিকে আবার হত্'বিকে ফিরে পেয়ে কুমার আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। সে রাতে দুজনের কথা আর ফুরায় না। কথা কথা বলতে বলতে কখন যে ভোর হয়েছে সেদিকে তাদের খেয়ালই রইল না।

সকালে হত্'বিকে দেখে রাজবাড়ির সকলে অবাক হয়ে গেল। তাদের প্রিয় পুত্রবধুকে আবার ফিরে পেয়ে রাজবাড়িতে আনন্দের রোল পড়ে গেল। নিমিষে রাজবাড়িতে আগের সেই প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসল। রাজবাড়িতে সৃষ্টি হলো উৎসব মুখর পরিবেশ।

এদিকে শয়তান বুড়ির মেয়ে ধত্'বি দেখে মহা বিপদ। তাদের সব ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে। এবার নিশ্চিত প্রাণটা যাবে। প্রাণের

মায়া বড় মায়া। প্রাণে বাঁচার জন্য ধঅ্'বি হঅ্'বির পায়ের উপর আঁছড়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমা চাইল, "দিদি আমি তো তোরই ছোট বোন, আমি লোভে পড়ে পাপ করেছি। তুই আমাকে ক্ষমা করে দে। তুই তোর ছোট বোনকে মারিস না।"

হঅ্'বির মন ছিল খুব নরম। ধঅ্'বির কান্না দেখে তার মন গলে গেল। বোনকে সে কোন শাস্তিই দিতে পারল না। তার সব দোষ মাফ করে দিল। তবে রাজবাড়ির লোকজন কিন্তু তাকে ঠিকই ঘৃণার চোখে দেখল। রাজবাড়িতে তার আর জায়গা হলো না। তাকে দুরদুর করে তাড়িয়ে দিল। পাছে আবার নতুন কোন ষড়যন্ত্র করে।

হঅ্'বিকে পেয়ে রাজা রাণী মহা খুশি। রাজবাড়িতে যেন খুশির মেলা বসল। রাজার আদেশে সারা রাজ্যে সাত দিন সাত রাত ধরে আনন্দ উৎসব চলল। সমস্ত রাজ্যে যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। আবারো গরীব দুঃখিদের খাবার, অর্থ এবং বস্ত্র বিতরণ করল। সকলে প্রাণভরে আশীর্বাদ করল রাজবধুকে।

কুমারের আদেশে হঅ্'বির বুড়ো বাপকেও সসম্মানে রাজবাড়িতে আনা হলো। কুমার তাকে একেবারে রাজবাড়িতে থেকে যাওয়ার অনুরোধ করল। বুড়ো বাপ সে আবদার ফেলতে পারল না। থেকেই গেল রাজবাড়িতে। বাপকে কাছে পেয়ে হঅ্'বি মহা খুশি। তার সুখে কুমারও সুখী। আরো বেশি সুখী হলো রাজ্যের সকল প্রজা। সকলের মুখেই রাজবধুর প্রশংসা।

বেশ কয়েক বছর পরে রাজা পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে পরপাড়ে গমন করে। রাণীও সেই শোক কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। তিনিও গত হলেন। রাজা রাণীর মৃত্যুর পর পুরো রাজ্যের নতুন রাজা হলো কুমার আর হঅ্'বি রাণী হলো নতুন রাণী। এরপর রাজা রাণী মিলে পরম সুখে রাজ্য শাসন করতে লাগল।

কিংবদন্তি আছে, আমাদের দেশে যে হলুদ পাখি দেখা যায়, হঅ্'বিই সে পাখি হয়ে এখনো আছে।

চম্পক নগরী

খ্রিস্ট জন্মের ছয়শত বছর আগে প্রাচীন ভারতে ষোলটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। এদের বলা হত ষোড়শ মহাজনপদ। ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত রাজ্য ছিল মগধ। মগধের অবস্থান ছিল বর্তমান বিহারে। মগধের প্রথম রাজধানী ছিল রাজগৃহ। পরে রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল গঙ্গা নদীর পাড়ে।

সর্ব প্রথম মগধ শাসন করেছিল হর্যঙ্ক বংশের রাজারা। এই হর্যঙ্ক বংশের একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন সম্রাট বিম্বিসার। ইনি ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। সম্রাট বিম্বিসার বুদ্ধকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। নিয়মিত ধ্যান করতেন, দান করতেন। রাজগৃহ তখন দার্শনিকদের নগর হয়ে উঠেছিল। বিম্বিসার দার্শনিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন।

ষোড়শ মহাজনপদের একটি ছিল অঙ্গ রাজ্য। রাজ্যটি ছিল মগধের পূর্বে। চম্পা নামে একটি নদী ছিল মগধ আর অঙ্গরাজ্যের মাঝখানে। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল চম্পানগরী।

বিম্বিসার অঙ্গরাজ্যের চম্পানগরী আক্রমণ করেছিলেন। কিংবদন্তি রয়েছে বিজয় গিরি ছিলেন অঙ্গ রাজ্যের চম্পা নগরীর রাজপুত্র। সম্রাট বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক। তবে তিনি বুদ্ধকে অত্যন্ত সমীহ করতেন। নিয়মিত ধ্যান করতেন, দান করতেন। বুদ্ধের মতো সম্রাট বিম্বিসার অহেতুক হত্যা পছন্দ করতেন না। তাই সম্রাট বিম্বিসার বিজয় গিরিকে হত্যা না করে সসৈন্য নির্বাসিত করেছিলেন।

সসৈন্য পূর্বমুখী অগ্রসর হয়ে মগরাজ্য আরাকান অবধি এসেছিলেন বিজয়গিরি। কিংবদন্তি আছে আরাকানেই কোন নগর গড়ে তুলেছিলেন। যা আজও আবিষ্কার হয়নি।

এদিকে চাকমা উপকথা মতে, এক কালে চম্পক নামে চাকমাদের এক নগর ছিল। অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল সে নগরী। চাকমা জাতির

নিজস্ব নগরী। চাকমারা ওখানেই ফিরতে চায়। কেননা, একদা ওখানেই উত্থান হয়েছিল ওদের। সেই নগরের যুবরাজের নাম ছিল বিজয় গিরি। তার সেনাপতির নাম ছিল রাধামোহন। একদা বিজয় গিরির মাথায় অভিযানে বেরুবার ভূত চাপে। তাই বিজয় গিরি ২৬ হাজার সৈন্য নিয়ে অভিযানে বেরুলেন নদী পথে। কত দিন যে কাটল! কত কত জনপদ যে জয় করলেন বিজয় গিরি! এ নিয়ে অবশ্য চাকমাদের মাঝে একটা গান প্রচলিত আছে,

তরকারি রেঁধে ভাত খেলে,
সমুদ্র সাগর লাগ পেলে।
সঙ্গে নিয়ে সৈন্যগণ,
রোয়ং কূলে পৌঁছে গেল রাধামোহন।

বিজয় গিরির অভিযাত্রা ছিল পুবমুখো। অর্থাৎ, প্রাচীন বঙ্গের দিকে। তার যাত্রাপথে পড়ল মেঘনা নদী এবং চাটিগাঙ (চট্টগ্রাম)। বিজয় গিরির সসৈন্য যাত্রা অব্যাহত রইল। চাকমা উপকথামতে, বিজয় গিরির অভিযানের সময়কাল ছিল ১২ বছর। তারপর সেনাপতি রাধামোহনকে যুবরাজ বিজয়গিরি চম্পক নগরে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। পরে বিজয়গিরি শুনলেন যে তার ভাই চম্পক নগরের রাজা হয়েছে। বিজয় গিরি সংঘর্ষ এড়াতে চম্পক নগরের আর না ফিরে পুবের অরণ্যের দিকে যেতে থাকলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম পেড়িয়ে আরাকানের দিকে এগিয়েছিলেন তিনি।

তবে জীবন নিরুদ্রপ ছিল না। আরাকান ছিল মগদের রাজ্য। প্রাচীন কাল থেকে আরাকানীরা মগ নামে পরিচিত। তারা নতুন টিবিটো-বারমান ভাষী অভিবাসীদের তাদের অঞ্চলে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিল। তাছাড়া ছিল বাঘের উৎপাত। গহীন অরণ্য, বাঘ তো থাকবেই। একটি চাকমা গানে সে দুরাবস্থার কথাও উঠে এসেছেঃ

ঘরত গেলে মগে পায়
ঝারত গেলে বাঘে খায়,

মগে ন পেলে বাঘে পায়
বাঘে ন পেলে মগে পায়।

কিংবদন্তি আছে এই দুরাবস্থার মধ্যেও বিজয়গিরি আরাকানের একটা গহীন অরণ্যে একটা নগরী গড়ে তুলেছিলেন।

রাজপুত্র বিজয় গিরির সময়ে আরাকানের গহীন অরণ্যে গড়ে ওঠা নগরীই কি চম্পক নগরী? নাকি বিম্বিসার যে অঙ্গরাজ্যের চম্পানগরী আক্রমণ করেছিলেন সেটি? এ নিয়ে অনেক কিংবদন্তি আছে এখনো।

শিয়ালনীর উপস্থিত বুদ্ধি

এই ঘটনা গোজেন পৃথিবী সৃষ্টি করার পরেরই। তখনো মানুষ সৃষ্টি করা হয়নি। পৃথিবী জুড়ে শুধু পশু পাখির অবাধ বিচর সেসময় এক বনে থাকত এক শিয়াল। শিয়াল ছিল সঙ্গীহীন। এ একা বনে বনে ঘুরে বেড়ায় আর বুনো মুরগী ধরে খায়। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে একদিন দেখা হয়ে যায় এক শিয়ালনীর সাথে শিয়ালনীটা তখন সবেমাত্র একটা বুনো মুরগী ধরে খাওয়া শু করেছে। তা দেখেই শেয়ালটা প্রেমে পড়ে যায় শিয়ালনীর। কা গিয়ে বলে,

"একি তোমার রূপের ঝলক,
ফেলতে পারি না চোখের পলক!"

শিয়ালনীটাও ছিল একা। তাই শিয়ালের কবিতা শুনে প্রেমে প যায় শিয়ালনীও। এভাবেই তাদের প্রেম হয়, বিয়েও হয়। জুটি বেঁ থাকা শুরু করে। কিন্তু ওদের নির্দিষ্ট কোন আস্তানা নেই। ওরা ব বনে ঘুরে ফেরে, আহার খুঁজে খায়-দায় এবং দিন কাটায়।

কিছুদিন যেতে না যেতেই শিয়ালনী গর্ভবতী হয়। তা দে শিয়াল মহাখুশি। এরপর কেটে যায় আরো বেশ কিছুদিন। ঘনি আসে তার প্রসবের দিন। তাই শিয়ালনী একদিন শিয়ালকে বলে "ওগো শুনছ, আমার সন্তান প্রসবের দিন প্রায় ঘনিয়ে এসেছে এক্ষুনি চল, কাছাকাছি কোথাও একটা গর্ত খুঁজে নিই।" তা শু শিয়াল মাথা নাড়ে। ভাবুক হয়ে বলে – "সত্যিই তো, বাচ্চাদে নিরাপত্তার জন্য একটি ভাল আস্তানা দরকার। তাই চল, দু'জ মিলে সুবিধেমতন গর্ত একটি খুঁজে বের করি।" এই কথা শুনা পর শিয়ালনী রাজি হয়ে যায়। তারপর ওরা দুজনেই একস একটি গর্ত খুঁজতে বের হয়।

কিছুদুর যেতে-না-যেতেই হঠাৎ করে প্রসব ব্যথা উঠে শিয়ালনীর যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল শিয়ালনী। সে কাতর স্বরে শিয়ালকে বলল "আমার তো প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। আমি আর হাঁট

পারছি না।" এ কথা শুনে শিয়াল গভীর সহানুভূতির দৃষ্টিতে শিয়ালনীর মুখের দিকে তাকাল। তারপর কোমল স্বরে বলল, "কষ্ট করে একটুখানি চলার চেষ্টা কর। আর একটু সামনে আগাই। সামনেই কোন গর্ত থাকতে পারে। গর্তের মধ্যে পৌঁছাতে পারলেই তুমি আর ছানাদের রাখার নিরাপদ।"

শিয়ালনী নিরুত্তর থেকে গেল। তার যন্ত্রণার বিবর্ণ মুখখানি তুলে বলল, "দেখি আর কতটুকু চলতে পারি। আমাদের অনাগত বাচ্চাদের জন্য আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারি।" শিয়ালের কথায় শিয়ালনী প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করে চলার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রসব ব্যথা নিয়ে কি হাঁটা যায়। তাই একটুখানি গিয়েই সে মাটিতে ধপ্ করে বসে পড়ল, কাতর স্বরে শিয়ালকে উদ্দেশ্য করে বলল, "না, আর কিছুতেই পারছি না। আমার প্রবলভাবে প্রসব যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। দেখছি এখানে এই খোলা জায়গায় আমাকে সন্তান প্রসব করতেই হবে।"

এই বলে শিয়ালনী কাতরাতে লাগল প্রচণ্ডভাবে। এই অবস্থায় শিয়াল বেচারা আর কী-ই বা করতে পারে। সে নির্বাক হয়ে কাতর ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে কেবল শিয়ালনীর দিকে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে জিহবা দিয়ে শিয়ালনীর গাঁয়ে চেটে দিতে লাগল। অস্থির হয়ে এদিক ওদিক হাঁটল কিছুক্ষণ। অপেক্ষা করতে লাগল ঠিক কখন যে বাচ্চা প্রসব হয়ে যায়।

অনেকক্ষণ চলল এই প্রসব ব্যথা। শিয়ালনী তো ভেবেছিল মরেই যাবে। প্রায় এক প্রহর পরে শিয়ালনির পেট থেকে বেরিয়ে আসল পাঁচ পাঁচটি ছানা। প্রসব করা হতেই ক্লান্ত শরীর নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পড়ে রইল শিয়ালনী। এদিকে শিয়াল তো মহাখুশি পাঁচ পাঁচটা ছানা পেয়ে। অনেকক্ষণ পর শিয়ালনী ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল। পাশেই বসে থাকা শিয়ালকে দেখতে পেয়ে ক্লান্ত ও ক্ষীণ গলায় বলল- "প্রসবের পর আমি বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি। একটুও নড়তে পারছি না। এদিকে আমার খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ডভাবে। এই অবস্থায় তুমি আমার জন্য কিছু আহার জোগাড় করে এনে দিবে? নয়তো আমি না খেয়েই মারা যাবো।"

শিয়ালনীর মুখে মৃত্যুর কথা শুনে কেঁপে উঠল শিয়াল। সে যে শিয়ালনীকে বড্ড বেশি ভালোবাসে। তাছাড়া এখন পাঁচটা ছানাও আছে। শিয়ালনীর কিছু হয়ে গেলে এই ছানাগুলোর যত্ন নিবে কে? তাই সাথে সাথেই শিয়াল বলল, "তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। আমি খাবারের সন্ধানে বেড়ুচ্ছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসব। নিজের আর আমাদের সাবকের খেয়াল রেখো।" এই বলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল শিয়াল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল গহীন অরণ্যে।

শিয়াল আহারের সন্ধানে চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই শুকনো পাতা ভাঙ্গার খসখস শব্দ শুনে চমকে উঠে শিয়ালনী। শব্দের উৎসের দিকে তাকাতেই তার গা শিউরে উঠে। তার থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা মোটাসোটা ডোরকাটা বাঘ লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বাঘটাকে দেখে বেশ ক্ষুদার্ত মনে হচ্ছে। বাঘটা চুপিসারে সামনে এগুচ্ছে, যতই সামনে এগুচ্ছে ততই যেন বাঘটার চেহারায় ফুটে থাকা হিংস্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ যে সাক্ষাৎ যমদূত, মৃত্যু শুধু সময়ের দাবি। এই সংকটময় মুহূর্তে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কী করা যায়, তা নিয়ে ভাবতে লাগল শিয়ালনী। তাদের মতো ধূর্ত প্রাণী এভাবে বেঘোরে প্রাণ হারাতে পারে না। হঠাতই শিয়ালনীর মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল।

সে তখন বাঘটাকে দেখেও না দেখার ভান করে বসে থাকল। বাঘকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, "সন্তান বিয়োবার পর আমার এমনই ক্ষিধে পেয়েছে যে, এখন সামনে যাকে পাই তাকেই খাই। আর ঐ নিকম্মার ঢেকি শিয়ালটার কথা তো বলে লাভ নেই। তাকে কখন যে পাঠালাম আস্ত একটা জ্যান্ত বাঘ ধরে আনতে বলে, তারও দেখা নেই।" এতোটুকু বলেই জিহবা বের করে ঠোঁট চাটল শিয়লানী। তারপর আরো উচ্চ স্বরে বলা শুরু করল, "আহা! এই মুহূর্তে যদি একটি জ্যান্ত বাঘের দেখা পেতাম, তাহলে তার রক্ত দিয়ে তেষ্টা মেটাতাম, কলিজাটা আমি খেতাম আর বাচ্চাদের বাঘের মগজ খাওয়াতাম। ঐ নিষ্কম্মাটার জন্য শুধু হাড়গোড় ফেলে রাখতাম, ইশ একটা বাঘ পেলে কতোই না মজা হতো।"

দূর থেকে শিয়ালনীর কথাগুলো বাঘ শুনতে পেল। শোনা মাত্রই বাঘের পিলে চমকে উঠল, "এ আবার বলে কি! জ্যান্ত বাঘের কলিজে খাবে? এ যে দেখছি সাক্ষাৎ রাক্ষস! আমার ভাগ্য ভালো মাঝপথে শেয়ালের সঙ্গে দেখা হয় নি অথবা এক্ষুনি শিয়ানীর কথাগুলো শুনতে পেয়েছি, তা না হলে আজ তো বেঘোরে আমার প্রাণটি চলে যেত।" এসব ভেবেই হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল বাঘটা। কিন্তু এই মুহূর্তে সে করবেটা কী? এখানে থাকলে যেকোন সময় শিয়ালনীর চোখে পড়ে যেতে পারে, আবার দূরে গেল শেয়ালের হাতে ধরা পড়বে। কী করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু এখানে থেকে মরার চেয়ে দূরে গিয়ে মরা অনেক বেশি ভালো। তাই পড়ি মরি করে বাঘটা লেজ তুলে দিল ছুট আর ছুট। থামার নামগন্ধ নেই, পেছন ফিরে তাকাবারও যেন ফুরসৎ নেই।

এদিকে গাছের উপর বসে এক বানর বসে কলা খাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো দূর থেকে কোন ঝড় ছুটে আসছে। ভালো করে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেল ঝড় না, ধুলো উড়িয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে একটা বাঘ। বাঘটাকে এমন বেহাল অবস্থায় ছুটতে দেখে গাছের উপর থেকে হুলো বানরটা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলল- "ও-বাঘমামা, ও-বাঘমামা, হয়েছে কি? এমন মরণ পণ ছুটছ কেন? মনে হচ্চি যেন ভূতে তাড়া করেছে।"

বানরের ডাক শুনে বাঘটি থমকে দাঁড়াল। আশেপাশে তাকিয়ে দেখে নিলো কোন শিয়াল আছে কিনা। আশেপাশে কাউকে দেখতে না পেয়েও যেন স্বস্তি পেল না সেভাবে। তবুও হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "আর বলিস্ নে ভাগ্নে, সাক্ষাৎ যমদূত দেকে এসেচি। ভাগ্যিস্ আমি দূর থেকে শিয়ালনীর কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলুম, নইলে আজ বাপের দেয়া প্রাণটিই হারাম।" বাঘের কথা শুনে নড়েচড়ে বসল বানরটা। তারপর বলল, "কী এমন হয়েচে গো খুলে বল দেখি। শিয়ালনী তোমাকে কী বলেছে যে তুমি এভাবে দৌড়চ্চ?"

বাঘ তখনো হাঁফাচ্ছে আর চারদিকে নজর বুলাচ্ছে। বানরের প্রশ্নের জবাবে হাঁপাতে হাঁপাতে বাঘ বলে, "শিয়ালনীর পেটে রাক্কস ঢুকেছে বাঘনে। সে বলে কিনা, জ্যান্তবাঘের কলজে খাবে। তাই তো আমি প্রাণ-ভয়ে পালালাম।" বাঘের কথা শুনে বানরটি হো হো করে হেসে উঠল, এমন আজগুবি কথা তার জীবনে শুনেনি। হাসি না থামিয়েই বানরটা বলল- "বলছ কি মামা, শিয়ালনী জ্যান্ত বাঘের কলজে খাবে? এমন আজব কথা তো কক্ষনো শুনিনি।"

বানরের হাসি শুনে বাঘের গায়ে জ্বালা ধরে। বানরের সাহস তো কম না তার উপর হাসছে। বাঘ বেশ রেগে মেগে বানরকে উদ্দেশ্য করে বলল, "ভয়ে আমার এদিকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার অবস্থা, আর তুমি কিনা দিব্যি হাসছ। তোমার সাহস তো কম না।" বাঘের গর্জন শুনে বনরের হাসি কমল। কিন্তু পুরোপুরি হাসির রেষ কাটল না। বানরকে কিছু বলতে না দিয়েই বাঘ আবারো বলল, "আমি শিয়ালনীর কথাগুলো নিজের কানে শুনে এলাম। আসলে তুই তো দেখিসনি, শিয়ালনীর চেহারাটা ছিল সত্যিই ভয়ঙ্করী। বারবার জিহবা দিয়ে ঠোঁট চাটছিল আর ঘন ঘন মাথা নাড়ছিল। আর উপরওয়ালার কাছে দোয়া করছিল দ্রুতই যেন একটা বাঘ মিলিয়ে দেয়। ভাগ্যিস আমি দূর থেকে শুনেছিলাম, কাছে গেলে নির্ঘাৎ আজ প্রাণটি আমার চলে যেত। তাই ভাগ্নে, তুই যা বলিস নে কেন, আমি কিন্তু পালাচ্ছি।"

এই বলে বাঘটি পূনরায় লেজ তুলে দৌড়াতে লাগল। বানরও কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। সে বাঘের পিছে পিছে দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে বলতে লাগল, "ও বাঘমামা! ও বাঘমামা! আমার কথাটি একবার শোন তো। শিয়ালনী তোমাকে নিশ্চিত বোকা বানিয়েছে। আর তুমি শুধু শুধু ভয়ে পালাচ্ছ।" বানরের এমন কথা শুনে বাঘটি পূনরায় থামল। তখন বানরটিও থেমে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগল- "মামা, আমার কথাটি একবার গভীরভাবে ভেবে দেখো। এমন ছোটখাটো শিয়াল কেমন করে তোমার মতো বিশালদেহী বলবান পশুরাজকে ধরে খাবে, বল? সাধারণ শিয়ালের ভয়ে তোমার যদি এমন দশা হয় তাহলে হাতির ভয়ে তো তুমি জায়গাতেই দমবন্ধ হয়ে মরে থাকবে। আর তুমি শিয়ালনীর ভয়ে পালাচ্ছ এই খবর

যদি বনের অন্য পশুদের মধ্যে চাউর হয়ে যায়, তখন তোমার মান-ইজ্জত থাকবে কি? তোমাকে তখন কেউ আর ভয় পাবে? তোমাকে কি কেউ পশুরাজ মানবে?"

বাঘটি সব কথা শুনল, কিন্তু কিছুতেই শিয়ালনীর কথাগুলো ভুল ভাবতে পারছে না, তার কথাগুলো উড়িয়ে দিতে পারছে না। তাই বানরের উদ্দেশ্যে বাঘ বলল, "তোর কথা সবই ঠিক আছে। কিন্তু ভাগ্নে, ঐ শিয়ালনীটা তার কথাগুলো এমন জোর দিয়ে বলছিল যে, সামনে পেলে সে সত্যিই আমাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খেত। কী ভয়ংকর সেই চেহারা! তাছাড়া, সন্তান বিয়োবার পর তার সেই কঙ্কালসার চেহারাটা আমার কাছে এমন বিদঘুটে লেগেছিল যে, তারদিকে তাকাতেই আমি চমকে গিয়েছিলাম।" এতোটুকু বলেই একবার ঢোক গিলল বাঘটা, তারপর আবার বলা শুরু করল, "আমার মনে হয়েছিল তার উপর নিশ্চয়ই কোন জাদুশক্তি ভর করেছে। দেবরাজ গোজেন নিশ্চয়ই তাকে কোন দৈব শক্তি দিয়েছে। তা না হলে, সাধারণ এক শিয়ালনী কী করে এতো জোর দিয়ে এমন কথা বলতে পারে?"

বাঘের এই আতঙ্কিত সংলাপ শুনে বানরটি বুঝল এখন বাঘের অবস্থা এমন হয়েছে যে তাকে আর যুক্তি দিয়ে কিছুই বোঝানো যাবে না। শিয়ালনীর ভয়ে তার যুক্তিজ্ঞান সব লোপ পেয়েছে। কী করে বাঘের এই ভয় দূর করা যায় তা নিয়ে ভাবতেই একটা বুদ্ধি এসে গেল বানরের মাথায়। তাই সে কথার সুর পাল্টে নিয়ে বলল — "আচ্ছা মামা, তোমার কথা না হয় আমি মানলাম। কিন্তু সদ্যপ্রসবা সেই শিয়ালনীর চেহারাটা কেমন ভয়ঙ্করী, তা আমাকে একবার দেখাবে তো? দেবরাজ গোজেন কী এমন দৈবশক্তি দিয়েছে তা আমিও দেখতে চাই। না হলে মরেও শান্তি পাব না।"

বানরের মুখে এমন অলুক্ষণে কথা শুনে বাঘ ভয়ে চিৎকার করে উঠল, "কী আবল তাবল কথা বলছিস ভাগ্নে? তুই যাই বলিস না কেন আমি কিন্তু ওদিকে কিছুতেই আর পা মাড়াচ্ছি না। ঐ রাক্ষসীক এখন আবার দেখতে গিয়ে না আবার প্রাণ হারাই।" বানর কিন্তু একরোখা মনোভাব নিয়ে বসল। সে বাঘ মামাকে পুনরায়

শান্ত গলায় বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলল- "বাঘমামা, আমার কি মরার ভয় নেই? আমরা যদি ওদিকে যাই তবে কি শেয়ালের কাছে গিয়ে তাকে দেখতে যাব? আমরা তাকে দেখব নিরাপদ দূরত্ব থেকে। তাছাড়া এখন তো তুমি আর একা নও। আমিও বরাবর তোমার সঙ্গেই থাকব। তাই অতো ভয় পাবার কিছুই নেই। যা হবে দুজন মিলেই দেখব নে।"

বানরের কথা শুনে এবার বাঘটি কিছুটা যেন আশ্বস্ত হলো। তবুও তার মন থেকে পুরোপুরি ভয় গেল না। সে বসে বসে একটুখানি ভাবল। পরক্ষণেই একটা চিন্তা তার মাথায় ধরা দিল। তাই বাঘ এক লাফ দিয়ে উঠে বলল, "তুমি একা নও বলচিস কেন? কাছে গেলে শিয়ালনী যদি সত্যি সত্যি আমাদের আক্রমণ করে বসে, তখন তুই তো একলাফে চড়ে যাবি গাছের উপর, আর অমি পড়ে থাকব গাছতলায় মাটিতে। তখন শিয়ালনী মজা করে আমার কলিজা খাবে। তুই যাই বলিস না কেন, আমি কিন্তু যাচ্ছি না তোর সাথে।"

বানর কিন্তু এবার হতাশ হয়ে গেল। কিভাবে বাঘকে রাজি করানো যায় তা নিয়ে চিন্তা শুরু করল। আর তখনই তার মাথায় নতুন এক বুদ্ধি এসে ধরা দিল। সে বলল, "আচ্ছা মামা, তুমি যদি চাও তাহলে আমরা দু'জনের লেজ এক সঙ্গে বেঁধে নিতে পারি। উভয়ের লেজ একসঙ্গে বাঁধা থাকলে আমি তোমাকে ছেড়ে কক্ষনো পালিয়ে আসতে পারবো না। এতে তোমাকে একলা হামলা করার কোন সুযোগই নেই। এখন আর নিশ্চয়ই তোমার কোন আপত্তি থাকবে না?"

বাঘ ভেবে দেখল প্রস্তাবটি মন্দ নয়। এতে বানরের পালানোর কোন সুযোগই নেই। মরলে সে একা মরবে না, ঐ বানর বেটাকে নিয়েই মরবে। তাই সে রাজি হয়ে গেল। এবার বানর গাছ থেকে নেমে আসলো। কথা মতো তারা উভয়েই লেজের অগ্রভাগ একসঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধল। বাঁধা হতেই অতি সন্তর্পণে চলল সেই ভয়ঙ্করী শিয়ালনীর দর্শন লাভ করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল সেই কাঙ্খিত স্থানে। বাঘ কিন্তু পালানোর জন্য সদা প্রস্তুত। নিরাপদ দূরত্বে থেকেই শিয়ালনীকে বাঘ আর বানর দেখতে লাগল। এর মাঝেই বানরটি বলে উঠল, "এই হাড্ডিসার শিয়ালনীকে দেখে তুমি দৌঁড়ে পালিয়েছ? চলো আরো সামনে এগিয়ে যাই।" এদিকে বাঘ আর বানর যখন মোটামুটি অনেকটা দূরে ছিল তখনই শিয়ালনীর নজরে পড়েছিল তারা। বাঘ ও বানরকে লেজে লেজে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে প্রথমেই হকচকিয়ে গেল।

কিন্তু একটুখানি ভেবেই সে অনুমান করতে পারল যে, বানরটির উস্কানিতেই বাঘ আবারও ফেরত এসেছে। তাই বানরকে একটা শিক্ষা দিতেই হয়, ভাবল শিয়ালনী। যে ভাবনা সেই কাজ। শিয়ালনী পুনরায় সেই আগের ভঙ্গীতেই আপন মনে বলতে লাগল- "শিয়ালটির দেরী হচ্ছে দেখে একটি দুলো বানরকে ডেকে আনলাম। তাকে পেটভরে ফলমূল খাওয়ালাম। তার পর এতো করে অনুরোধ করে বললাম যে, লক্ষী ভাইটি আমার, তুমি একটি জ্যান্তবাঘ ভুলিয়ে ভালিয়ে লেজে বেঁধে নিয়ে এসো তো। আমি বাঘের মাংস খেয়ে একটু শান্তি পাই। কিন্তু হতচ্ছাড়া সেই বানরটিরও দেখা নেই। সেই গেল যে গেল, ফেরার কোন নামগন্ধও নেই। যত্তোসব নিকম্মার দল। কেবল মুখে বড় বড় কথা আর কাজে অষ্টরম্ভা। এদিকে জ্যান্তবাঘের কলজে খেতে না পেয়ে আমার যে প্রাণ যায়! আজ আসুক বানরটা, তার কলজে খেয়েই নিজের মনের স্বাদ মিটাব।"

শিয়ালনী তার কথাগুলো জোরে জোরে সুস্পষ্ট ভাবে বলল। সে চাচ্ছিল বাঘ আর বানর দুজনই যেন তার কথা পরিষ্কারভাবে শুনে। বলাবাহুল্য, বাঘ ও বানর দু'জনেই পরিস্কারভাবে শিয়ালনীর কথাগুলো শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটি রেগে গিয়ে বলে উঠল, "বিশ্বাসঘাতক বানর কোথাকার! আমাকে বলি দেওয়ার জন্য তোর তাহলে এই ষড়যন্ত্র! সুযোগ পেয়ে নেই তখন তোকে আমি ছাড়ছি না। ঘাড় মটকে এর প্রতিশোধ নিব। আপাতত পালিয়ে বাঁচি।"

এই বলে সে আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। ঝড়ের গতিতে পালাতে লাগল। তখন বাঘ ও বানরের কান্ড আর দেখে কে! বাঘের লেজের টানে হেঁচড়ে চলল বানর। এদিকে বানরটি যন্ত্রনায় মরণ-চিৎকার দিয়ে উঠল। জোরে জোরে বলতে লাগল, "ও মামা, শিয়ালনী মিথ্যে কথা বলছে, তার কথা তুমি বিশ্বাস করো না। ও আমাকে ফাসাচ্ছে। তোমার সরলতার সুযোগ নিয়ে তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। থামো মামা, থামো।" কিন্তু কে কার কথা শোনে। বেচারা বাঘ তো পালাচ্ছে প্রাণভয় নিয়ে। তাকে থামাবার সাধ্যি কার। বাঘের থামাথামির নামগন্ধ নেই। সে ছুটছে তো ছুটছেই। আর এদিকে বানরটি হেঁচড়ে চলছে তো চলছেই। বাঘের এই হ্যাঁচড়া টানে বানরের পুরো শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। মাথা ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল। প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবার অবস্থা।

এই ভাবে হেঁচড়িয়ে যেতে যেতে এক সময় বানরটি মস্ত বড় একটি গাছের গুড়িতে গেল আটকে। তখনই বাঘের প্রচন্ড হ্যাচকা টানে হঠাৎ খুলে গেল উভয়ের লেজের বাঁধন। ছাড়া পেয়ে বাঘটি আর পেছন ফিরে না তাকিয়েই দৌড়ে পালালো। আর বেচারা বানরটি তার ক্ষত-বিক্ষত দেহটি নিয়ে গাছের গুড়িতে পরে রইল। মূমুর্ষ অবস্থায় যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল। এদিকে শিয়ানলী এই অভূতপূর্ব দৃশ্যটি দেখে বেজায় হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরাল। আর সেবারের মতো বুদ্ধির জোরে শিয়ালনীটা নিজের প্রাণ রক্ষা করল।

ডুলো কুমোরী (ডোলা কুমারী)

সাত ভাই আর এক বোন। বোনের নামটি ছিল ডুলো কুমোরী। তাদের সাত ভাইয়ের নামে সে শুধু বোন তো নয় যেন আদরের সোনার টুকরো। মাচায় রাখলে পিঁপড়া কামড়াবে, মাথায় রাখলে উকুনে কামড়াবে। সাত ভাইয়ের প্রাণ যেন এই ডুলো কুমোরী। সে ছোট্ট থাকার সময় তার মা বাবা মরে যাওয়ার কারণে সে তার ভাইদের এতো প্রিয়। সাত ভাই বিয়ে করেছে, সাত ভাইয়ের বউরা হলেন সাত বিলের সাত চেঙির ওপর থাকে। সাত ভাইয়ের বউরা ডুলো কুমারীর সম বয়সী। কিন্তু তাদের প্রতিটি জনের কাছে এই আদরের ননদটি ছিল বিষের মতো। ডুলো কুমোরীর বউদিরা কেউই তাকে ভালোবাসতো না। দেখতে পারত না। সব সময় হিংসা করত। খুত খুঁজতেই থাকত।

কিন্তু এই কথা গুলো তারা তাদের স্বামীদের কখনো বলত না। নিজেদের মনের ভিতরে পুষে রাখে সেই সব ক্ষোভ। আর সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে। একদিন সাত ভাই গেল বাণিজ্যের জন্য অনেক দূর দেশ লঙ্কায়। সে দেশ রাক্ষস রাজ রাবণের দেশ। ঘর থেকে বেরুবার সময় তারা যে যার যার স্ত্রীকে বলে গেলেন বোনের যত্ন নিতে, ভালোবেসে আগলে রাখতে, "দেখো ডুলো কুমোরীকে একটু চোখে চোখে রেখো, সে যেন কোন কিছুতে কষ্ট না পায়। সে কষ্ট পেলে আমাদের কলজে ফেটে যায়।" তারা সবাই তাদের স্বামীদের কে হ্যাঁ বলে সম্বোধন করল। কিন্তু হ্যাঁ বললে কী হবে তাদের প্রত্যেকেই মনে মনে ভেবে রেখেছে অন্য বুদ্ধি।

যেদিন থেকে সাত ভাই ঘর থেকে চলে গেলেন সেদিন থেকে বউদিদের খারাপ আচরণ শুরু হলো। বের হয়ে এলো প্রত্যেকের আসল রূপ। তারা ডুলো কুমোরীকে সকলে সমান ভাবে কষ্ট দিতে লাগল। সাথে এমন কিছু কাজ দিতে লাগল যা সত্যিই অসম্ভব। যেমন ফুটো কলসি ভরা করে পানি আনা। পিচ্ছিল মাটিতে দৌঁড়ে যাওয়া। সাত বউদিকে আলাদা আলাদা পাখা দিয়ে বাতাস করা, চুল

আচড়ে দেওয়া, মাথা থেকে উকুন মারা আরো নানান কিছু। সেই সাথে কত বকাঝকা করল তার ইয়াত্তা নেই।

সাত ভাই বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর থেকে ডুলো কুমোরীর জীবনে আর কোন সুখ নেই। তার পরনের কিছু নেই, বউদিদের কথা মতো না চললে সে মার খায়। পান থেকে চুন খসলেই বৌদিরা বকা দেয়। সব যন্ত্রণা সহ্যের বাইরে চলে গেলেও সে মুখ বুজে সহ্য করতে লাগল আর মনে মনে গোজেনের (ঈশ্বর) কাছে প্রার্থনা করতে লাগল তার সাত ভাই যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আছে বাণিজ্যের থেকে।

একদিন সাত ভাইয়ের বউরা সন্ধ্যার সময় বাড়ির আঙিনায় বসে নানা কথা বলাবলি করছিল, হাসি ঠাট্টায় মেতে ছিল সবাই। গল্প জুড়ে ডুলো কুমোরীকে দিয়ে এক একজন করে মাথার উকুন আনাতে লাগল। ঠিক সেই সময় তাদের ঘরের চালের পাশ দিয়ে উড়ে যায় একটি চিল। চিলটি ঠোঁটে করে নিয়ে যাচ্ছে একটি হাঙ্গর মাছ। চিলটাকে দেখে ভাইয়ের বউরা বলে উঠলো।

চিলরে চিল
তোমার হাঙ্গর মাছটি
আমাদের দিয়ে যাও
আমাদের ডুলো কুমোরীকে
তোমার সাথে নিয়ে যাও।

তাদের সেই কথাটা শুনে চিলটি তার ঠোঁটে করে নিয়ে আসা হাঙ্গর মাছটি উঠোনের ধানের পাটিতে ফেলে দিল। এবার ডুলো কুমোরীকে তার আঙুল দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যায়। উড়ে গিয়ে উচুঁ গাছের ডালের একটা ফোকরে বসিয়ে রাখে। ডুলো কুমোরীর কিছু করার নেই, উচুঁ গাছের ডালের সেই ফোকর থেকে বের হয়ে নিয়ে নেমে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। এদিকে চিলটি ডুলো কুমোরীর চুলে বাসা বেঁধে ডিম পেরে দিল। ডুলো কুমোরীর যখন কিছুই করার থাকে না তার কপাল চাপড়ে চাপড়ে কান্না করতে থাকে। কান্না করতে করতে বলে উঠে...

তারা আনতে বাবার দেশ
চাঁদ আনতে মায়ের দেশে
সাই ভাই গিয়েছে লংকা সাগরে
আমি ডুলো কুমারী চিলের বাসায়
এসো বাপ ভাইয়েরা দরবারে যায়
দরবারে গিয়ে কিছুই নাই
ডাল ছাড়া বেল ফল ভাগ করে খায়।

ডুলো কুমারী সবসময় সেই কথা গুলো বলে বলে কাঁদে। এমন সময় তার সাত ভাই বাণিজ্যের কাজ শেষ করে এক সাথে বাড়িতে ফিরছিলেন। হঠাৎ করে ডুলো কুমারীর কপাল চাপড়ে চাপড়ে কান্না করার শব্দ শুনতে পায় সাত ভাই। কণ্ঠটা কোন দিক দিয়ে আসছে সেইটা অনুসরণ করে সবাই। বড় গাছের তলায় গিয়ে তারা ডুলো কুমারী কে দেখতে পায়। এ দেখে প্রত্যেক ভাই বিস্ময়ে হা হয়ে যায়। এক ভাই দ্রুত গাছে উঠে যায়। তারপর সাবধানে তাদের আদরের বোনটাকে গাছ থেকে নামিয়ে আনে। এবার বোনকে নিয়ে প্রত্যেক ভাই বাড়ি ফিরে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে। বাড়ি ফিরে প্রত্যেক ভাই নিজেদের বউদের উচিত শিক্ষা দেয়।

"পাগালা রাজা"

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে চাকমাদের একজন রাজার নাম ছিল "পাগালা রাজা"। শোনা যায় তিনি নাকি যোগসিদ্ধ ছিলেন এবং স্নানের সময় যোগবলে দেহের ভিতর থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করে নদীতে ধুয়ে মুছে তারপর ঐগুলি আবার যথাস্থানে ঢুকিয়ে রাখতেন। এ কাজ অবশ্য তিনি করতেন খুবই গোপনে, কাক পক্ষীও টের পেত না।

স্নান করতেন তিনি ঘরের ভিতরে এবং পর্দার আড়ালে। যথেষ্ট গোপনীয়তা সত্ত্বেও তাঁর সবকিছু একদিন ফাঁস হয়েছিল তাঁর প্রিয়তম রাণীর জন্যে; সে কাহিনীতে পরে আসছি।

পাগালা রাজার আদত নাম ছিল "সাত্তুয়া বরুয়া"। "সাত্তুয়া বরুয়া"র আগে "বুরা বরুয়া" নামে চাকমা রাজ "জুনু"র একজন সেনাপতি ছিল। এ কারণে অনেকে "বরুয়া" শব্দটিকে সেনাপতি বাচক মনে করেন।

সে যাক আমাদের কাহিনীর নায়ক "পাগালা রাজা" বা পাগলা রাজা, তাঁর নামে আজও শিশুরা ছড়া কাটে,

"মুনি ঋষি ধ্যানে গর
পাগলা রাজা
চিৎকলজ্যা খুয়েই
স্যান গরে।"

পাগালা রাজার রাজধানী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে মাতামুহুরি নদীর তীরে আলিকদমে। আলিকদম শব্দটি মারমাদের "আলেহ্ খ্যং-ডং" শব্দের বিকৃত উচ্চারণ থেকে এসেছে। মারমা ভাষায় আলেহ্ খ্যং-ডং" শব্দের অর্থ হচ্ছে "পাহাড় এবং নদীর মধ্যবর্তী স্থান"।

পাগালা রাজা তাঁর রাজত্বকালে আলিকদমের আশে পাশে অনেক জায়গা আবাদ করিয়েছিলেন। তাই আজও আমরা আলিকদমের অনতিদূরে তাঁর নামে "পাগালা বিল" নামক স্থানটি দেখতে পাই। চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে তাঁর নামে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

বেচারা পাগালা রাজা। তিনি প্রথম থেকেই পাগল ছিলেন না। আর শখ করেও কারোর সামনে নিজের নাড়িভুঁড়ি বের করেননি। ঐ রকম ইচ্ছাও ছিল না। তাঁর জীবনের সমস্ত অনর্থের মূলে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, মানে রাণী। রাণী একদিন কৌতুহল বশতঃ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থেকে রাজার স্নান কার্য দেখছিলেন। এই সময় রাজা পেটের ভেতর থেকে তার নাড়িভুঁড়ি বের করা মাত্র রাণী সে দৃশ্য দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

তাঁর বিকৃত স্বরের চিৎকার শুনে রাজা তাড়াতাড়ি নাড়িভুঁড়ি দেহের ভিতরে বসালেন কিন্তু তাড়াহুড়ায় ঠিকমত বসাতে পারলেন না। ফলে দিন কিছু যেতে না যেতে রাজার মাথা খারাপ হয়ে গেল। এ হলো রাজার পাগলা হওয়া সম্পর্কে চাকমাদের কিংবদন্তি। তবে এ বিষয়ে চাকমাদের অন্যতম উপদল তঞ্চঙ্গ্যাদের কাহিনীটি ভিন্ন ধরণের। তাদের মতে রাজা যখন নদীতে স্নান করছিলেন, তখন তিনি নিজের "চিৎকলিজা" (হৃদপিন্ড ও কলিজা) খুলে নদীতীরে একটা পাথরের উপর রেখেছিলেন ঐ সময় ঘটনাচক্রে একটা পাগলা কুকুর এসে ঐগুলি খাঁক করে খেয়ে ফেলে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর তরবারির আঘাতে কুকুরটিকে কেটে ফেললেন এবং ঐটির চিৎকলিজা নিজের দেহে স্থাপন করলেন। এতে রাজা প্রাণে বেঁচে গেলেন সত্য, কিন্তু পাগলা কুকুরের কলিজা দেহে স্থাপন করায় তিনি পাগল হয়ে গেলেন।

পাগল হয়ে রাজা শুরু করলেন নানা অত্যাচার এবং নরহত্যা। ফলে তাঁর ভয়ে লোকজন তাঁর সামনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল। এমনি ভাবে অনেক দিন চলে গেল। রাজার অত্যাচারে প্রজারা অস্থির হয়ে উঠল। রাজার অত্যাচার প্রজারা সহ্য করলেও পাত্রমিত্র এবং অন্যান্য ক্ষমতাবান সভাষদরা সহ্য করতে

তাদের বংশধরেরা আজও চাকমাদের মধ্যে "বর্বুয়া গঝা" নামে পরিচিত হচ্ছে। এ ভাবে রাজকার্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে বিশ্বস্থ লোকজনদের সরিয়ে রাজাকে হত্যা করার জন্য তারা সুযোগ খুঁজতে লাগল। সুযোগও মিলে গেল। রাজার ছিল দেব দেবীদের প্রতি অগাত ভক্তি-শ্রদ্ধা। আর তাই প্রায়ই তিনি পূজা অর্চনার জন্য মন্দিরে যেতেন। এমনি একদিন রাজা যখন পালকিতে চড়ে মন্দিরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মন্ত্রীরা "পাগলা হাতী! পাগলা হাতী" করে চেঁচিয়ে উঠল। স্বভাবতই রাজা ব্যাপার কি দেখার জন্য পালকির বাইরে যেই মাথাটা বের করেছেন, অমনি পালকির পিছনে লুকানো ঘাতক তরবারীর আঘাতে তাঁর শির দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রাজা নিহত হলেন। এ খবর চারিদিকে বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ল।

এ সময়ে রাণী এবং মন্ত্রীরা নিজেদের সমর্থকদের মাধ্যমে রাজ্যময় গুজব রটালো রাজা মন্দিরে যাওয়ার পথে পাগলা হাতীর আক্রমনে নিহত হয়েছেন। অনেকে সে কথা বিশ্বাস করল, আবার অনেকেই করল না। আসলে রাজবাড়িতে কী ঘটছে বা কী ঘটতে যাচ্ছে কারোর জানার উপায় ছিল না। কারণ সব কিছুই করা হচ্ছিল অত্যন্ত গোপনে। এমনকি রাজাকে প্রচলিত রীতি অনুসারে চিতায় দাহ করার পরিবর্তে মাটি চাপা দেওয়া হলো এবং জায়গাটি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেউই জানল না।

এরপর অবশ্য সবকিছু একদিন নিরবেই চুকে যেত যদি না রাজার মেয়ে অমঙ্গলী রাজাকে স্বপ্নে দেখত। রাজার ছিল ঐ একটিই মেয়ে এবং সে ছিল বড় আদরের। সে পরপর সাত রাত রাজাকে স্বপ্নে দেখল। রাজা তাকে স্বপ্নে বলছেন অতি শীঘ্রই তাঁর দেহের সাথে কাটা মুন্ডটি জোড়া লাগবে এবং তিনি আবার বেঁচে উঠবেন। কন্যার মুখে এহেন স্বপ্নের খবর শুনে রাণীর অন্তরাত্মা ভয়ে শুকিয়ে গেল। তাঁর মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবং অন্যান্য মন্ত্রীদেরও দেহ ছেড়ে প্রাণ বেরোয় বেরোয় করতে লাগল। কারণ সবার বিশ্বাস ছিল, রাজা ছিলেন দীর্ঘ দিনের তান্ত্রিক সাধক,কাজেই তারঁ পক্ষে আবার বেঁচে উঠা এমন কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কাজেই রাণীসহ মন্ত্রীরা একদিন সদলবলে ঢাল তলোয়ার নিয়ে রাজার কবরে

ছুটলেন। এবার অবশ্য তাঁদের পক্ষে আগের মত আর গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হলো না।

কারণ তাঁরা এতো বেশি ভয় পেয়েছিলেন যে তাঁরা রাজার কবরে রাতের বেলায় না গিয়ে অনেক লোকজনসহ দিনের বেলায় গিয়েছিলেন। ফলে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় রাজার কবর খোঁড়া হলো। আর সবাই বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, সত্যি সত্যিই রাজার কাটা মুন্ডটি তারঁ দেহে জোড়া নেয় নেয় অবস্থা। এই দৃশ্য দেখে রাণী তৎক্ষণাৎ ভীষণ আতঙ্কে রাজার দেহকে খন্ড খন্ড করার জন্য তারঁ দেহরক্ষীদেরকে আদেশ দিলেন। রাণীর আদেশে রাজার দেহকে সাতটি বৃহৎ খন্ডে খন্ডিত করে বিভিন্ন পাহাড় এবং নদীতে ফেলে দেওয়া হলো। লোকের বিশ্বাস এমনি একটি দেহখন্ড নাকি "পাগালা মুড়া'য়" মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। সেই পাগালা মুড়াটি (মানে পাহাড়টি) আজও ঐ ঘটনার সাক্ষী হয়ে আলিকদমের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে।

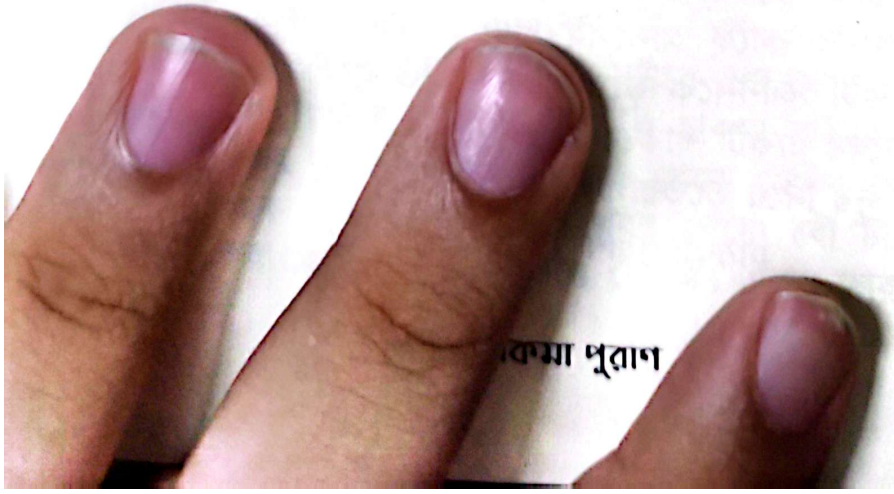

আমগদ চাকমা

অনেক-অনেকদিন আগে আমাদের এই পৃথিবীটা ছিল একদম জঙ্গলে ভরা। দু'চোখ যেদিকে যায় শুধু গাছগাছালি আর গাছগাছালি। এ যেন সবুজের এক সমারোহ। সেসময় মানুষজন ছিল খুবই কম, চাকমা তো আরো কম। চারদিকে শুধু ছিল বুনো জন্তু জানোয়ার। কিছু মানুষ ঘর বানিয়ে থাকা শুরু করলেও, বেশিরভাগ মানুষ জন্তু জানোয়ারের ভয়ে গাছে থাকত। তাতেও রক্ষা মিলত না। কিছু কিছু জন্তু জানোয়ার ছিল যেগুলো গাছে চড়তে পারত। সে সকল জন্তু জানোয়ারের আক্রমণে বেঘোরে প্রাণ হারাতো মানুষজন।

জন্তু জানোয়ারের বাইরে ছিল আরেক উপদ্রব। ভূত প্রেত সুযোগ পেলেই মানুষের ঘাড় মটকাত। এখনকার মত ভূতেরা তখন অত অদেখা হয়ে থাকত না, হর হামেশা তাদের দেখা যেত। সন্ধ্যে হতে না হতে ভূতেরা বেরিয়ে পড়ত দলে দলে। আকাশে ঘন কালো মেঘ জমলেও ভুতেরা বাইরে বেরিয়ে আসত। এছাড়া ভর দুপুরেও কিছু কিছু ভূত লোকালয়ে চলে আসত। দু'চারটা মানুষের ঘাড় মটকে আবার হাওয়া হয়ে যেত।

তখনকার দিনে সন্ধ্যার পর কোন চাকমা আর ঘর হতে বাইরে বের হতো না। রাতের বেলা কেউ কাউকে ডাকলে সাড়া দিত না। কেননা কারো ডাকে সাড়া দিলেই মুশকিল! ভূতের মানুষের রূপ ধরে আসত, তারপর মানুষের বেশেই ঘরে ঢুকে বসে থাকত আর সময় সুযোগ বুঝে ঘাড় মটকে দিয়ে চলে যেত। কাউকে যদি নেহাৎ রাতের বেলা বের হতেই হয় তখন ইয়া লম্বা একটা মশাল জ্বেলে নেয়।

আগুনকে নাকি ভূতেরা ভয় পায়, আগুনের কাছে কোন ভূত আসে না। আগুনের কাছে আসলেই ভূতেরা ঝলসে যায়। আগুন ছাড়াও আর একটা জিনিসকে ভূতেরা ভয় পেত বলে শোনা যায়। মেইয়্যা শাক নামের একটা শাককে ভূতেরা ভয় পেত। এই শাকের থেকে দশ হাত দূর দিয়ে ভূতেরা চলাফেরা করত। শুধু শাককে ভয়

পেয়েই তারা শান্ত থাকত না, মেইয়্যা শাক যারা খায় তাদেরও ভূত কিছু করতে পারত না, এমন বিশ্বাস ছিল চাকমাদের।

ভূতের উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্যে বাড়ির চারপাশে মেইয়্যা শাক বিজ বুনে রাখত চাকমারা। এতে করে বাড়িতে উঠার সাহস হত না ভূত, প্রেত কিংবা শাকচুন্নির। তাছাড়া কাউকে ভূতে তাড়া করলে সে চেষ্টা করত মেইয়্যা শাকের বনের ভিতর ঢুকে যাবার। একবার যদি মেইয়্যা শাকের বনে ঢোকা যায়, তখন আর ভূতের বাপের সাধ্য নেই সেখানে গিয়ে মানুষের ক্ষতি করবার। তখন ভূত নিজেই নিজের প্রাণ নিয়ে দৌড় শুরু করে। এই মেইয়্যা শাক অনেকটা মুলো শাকের মত। খাওয়া যায়, তবে মুলো হয় না।

তবে ভূতেরাও কিন্তু চালাক কম ছিল না। তারা সুযোগ সন্ধানী ছিল। চুপ করে গাছের উপরে বসে থাকত। আর অপেক্ষা করত কে কোথায় একলা রয়েছে, কোথায় আঁধার একটু ঘন, কোন পথে বন জঙ্গল একটু বেশি আর কোন দিকে মেইয়্যা শাকের বন নেই। একটুখানি সুযোগ পেলেই কাউকে দিল বিষম ভয় খাইয়ে, যাতে সে বেচারার দাতকপাট্টি লাগে। তবে মানুষজন যে ভূতেদের ভয় পেত এমন না। কিছু কিছু মানুষকে ভূতেরাও ভয় পেত। যেসকল মানুষ ভূত দেখেও একটু ভয় পেত না তাদের ভূতেরা এড়িয়ে চলার চেষ্টাই করত। কিন্তু ভুলে যদি কখনো সামনে পরে যেত তবে ভূতেরাই লেজ গুটিয়ে পালাতো। জেদী একরোখা আর বদমেজাজী লোকদের ধারে কাছে আসতে সাহস পায়না ভূতেরা। চাকমাদের ভাষায় এদের বলে 'অমগদ'।

একবার এমনি এক 'অমগদ' চাকমা গেছে কাট্টনে (ব্যবসার উদ্দেশ্যে দূর বনে গিয়ে বাঁশ, গাছ ইত্যাদি কেটে নিয়ে আসা।) তার বউকে একলা রেখে। এদিকে বউ ছিল প্রচন্ড পরিমাণে ভীতু। ভুতেরা এতোদিন "অমগদ" এর বউকে ভয় দেখাবার সাহস পায়নি সে বাসায় ছিল বলে। কিন্তু অমগদ চাকমা বাইরে যেতেই সুযোগ পেয়ে গেল ভূতেরা। অমগদ বাড়ি থেকে যেদিন গেল তার পরের দিনই এক ভূত এসে হাজির খবর পেয়ে। বৌ টা যেদিকে শোয় সেদিকের বেড়া খানিকটা ভেঙে ফেলল। এবার তার কালো লোমশ

হাতখানা ঢুকিয়ে দিল বেড়া দিয়ে। তারপর বৌকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এই নে, হাতটা এট্টুখানি দে দিকিনি চুলকে!"

বৌটা ত প্রথমে বেড়ার ফুটো দিয়ে তাকে দেখেই বেহুঁশ একবারে! অবশ্য বেহুশ হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল।

ভূতটার চোখগুলো যেন অগ্নিগোলক, আর সেগুলো এক একটা যেন এক একটা কমলালেবু। আর দাঁতগুলো আরো বেশি ভয়ংকর। সাদা মুলোর মত দাঁত, কুলোর মত বড় বড় কান আর টাকুর মত একখানা লোম!

এতে কার না ভিরমি হবে? বৌটার মূর্ছা ভাঙে আর ভূতটাকে দেখে আবার মূর্ছা যায়! মূর্ছা ভাঙে, ভূতটাকে দেখে আবার মূর্ছা যায়! এভাবে কয়েকবার মূর্ছা যেতে যেতে ভূত দেখা তার কাছে গা সহা হয়ে গেল এক সময়। শেষে আর ভিরমি খায়না। ভূতটা কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে সেই তখন থেকে, হাতাখানা বেড়ার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে। এতোক্ষণে বৌটাকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকাতে দেখে বল্ল সে, "নে আর ভয় পাস্নে, কিচ্ছু করব না তোকে। এট্টুখানি চুলকে দে হাতখানা, ভারি চুলকোচ্ছে।"

বৌ বেচারি কী আর করে? পালাবার জো নেই। তাই ভুতের হাতখানা নিয়ে তখন আস্তে আস্তে চুলকোতে থাকে সে। হাত চুলকাতে চুলকাতে রাতের প্রথম প্রহর চলে যায়, এদিকে যে বৌয়ের ঘুম পেয়েছিল সেটাও ভুলে যায়। আর ঘুমাবেই বা কিভাবে? ভুতটার এ হাতের চুলকানি কমে তো ও-হাত বাড়িয়ে দেয়, সে হাতের চুলকানি কমে তো পূনরায় আগের হাত বাড়িয়ে দেয়। এভাবে হাত চুলকাতে চুলকাতেই সারারাত পেরিয়ে ভোরের আলো ফুটতে থাকে। গাছে গাছে পাখিরা কিচিরমিচির ডাকতে থাকে। যেই না ভূতের উপর দিনের আলো এসে পড়ে অমনি পড়ি মরি করে ভূতটা হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

তবে ভূতের উপদ্রব কিন্তু থেমে যায়নি। পরদিন রাতেও ভূতটা এসে হাজির হয়। ভূতটা কিন্তু খুব চালাক ছিল। তাই বাড়তি কোন ঝুকি নেয় না। দূর থেকে জিজ্ঞেস করে আগে বৌটাকে, "এই তোর

জামাই ফিরেছে?" বৌ কাঁপা কাঁপা গলায় জবাব দেয়, "নাহ, ফিরেনি।" জবাব পাবার সাথে সাথেই ভাঙ্গা বেড়া দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়, "দে একটু চুলকে দে দিকিনি। তুই খুব ভালো চুলকোতে পারস।" বৌ আর কী করবে? চুলকাতে শুরু করে। আর এভাবেই সারারাত পেরিয়ে যায়।

এভাবে প্রতি রাতেই হাজির হতে থাকে ভূতটা। অমগদের খবর নিয়ে নেয় আগে। তারপর হাত বাড়িয়ে দেয়। এই করে রোজ ভোর হয়ে আর ভূতটা যখন হাওয়ায় মিলিয়ে যায় তখন বৌটার চুলকানো থামে। কিন্তু এভাবে কতদিন চলে? বৌটা দু'চোখের পাতা এক করতে পারে না রোজ রাত্তিরে। সারাদিন বাড়ির কাজ করে, জুম চাষ করে রাত্তিরে যখন ঘুমাবে তখনই ভূত বেটা এসে হাজির হয়।

ঘুমের অভাবে বৌয়ের চোখের নিচে কালি পড়ে। শরীর শুকাতে থাকে। কাজেও মনোযোগ দিতে পারে না। দিন দিন শুকাতে শুকাতে শেষ পর্যন্ত হাড্ডিসার হয়ে যায়। হঠাৎ একদিন অমগদ বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে বৌয়ের চেহারা দেখে অস্থির হয়ে পড়ে। বৌকে বুকে জড়িয়ে জানতে চায় তার এই অবস্থা হলো কিভাবে? স্বামীকে পেয়ে সব খুলে বলে বৌ। সব কথা শুনে তার স্বামী তো গেল বেজায় ক্ষেপে. সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, "দাঁড়াও দেখছি মজা ভূত ব্যাটাকে"! তারপর বৌকে উদ্দেশ্য করে বলে "শোন্ সে ব্যাটা যদি আজ আসে বলবি, আমি ঘরে নেই। তারপর ভূত বানিয়ে ছাড়ছি তাকে। আমার ঘরে এসে এমন জ্বালানো? এর শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ছি না।"

এই বলে স্বামী ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায়। তারপর তার রাম দা খানা বের করে গোয়াল ঘর থেকে। এবার সান দিতে থাকে দাঁড়ে। ক্যাচ্‌ ক্যাচ্‌ শব্দ করে দা শান হতে থাকে। শান্ হতে হতে সেটা যখন সাদা ঝকঝকে হয়ে অনেক বেশি ধারালো হয়ে উঠল তখন রেখে দিল শোবার ঘরে। সারাদিন কিন্তু সে নিজেও আর বের হলো না ঘর থেকে, পাছে ভূতটা তাকে দেখে ফেলে। ঘরে বসে বসেই প্রহর গুনতে লাগল। এভাবে দুপুর পেরিয়ে বিকাল হলো, বিকাল পেরিয়ে সন্ধ্যা, শেষে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের ঘন

আঁধারও নেমে আসল। রাতে খেয়ে দেয়ে তার বৌ ঘরে শুতে গেল। স্বামী সে কিন্তু খালি ঘরে বসে রইল বেড়ার ধারে হাতে রামদা নিয়ে। একটু বাদে সেই কাঙ্ক্ষিত সময় আসলো। ভূতটা এসে বাইরে দাঁড়িয়ে নাক দিয়ে শুঁকল বিপদের গন্ধ আছে কিনা। তারপর বৌকে ডেকে বলল "এই তোর জামাই ফিরেছে?"

বৌ কিন্তু স্বামীর শেখানো কথা বলল। সে রোজকার মতোই বলল, 'না, আমার স্বামী এখনো ফিরেনি।' ভূত তখন কিছু না ভেবেই নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিল বেড়ার ফুটো দিয়ে, "এইখানি চুলকে দে কিনিকি, বড্ড চুলকাচ্ছে।" এই সুযোগের অপেক্ষাতেই তো ছিল স্বামী। ভূতের লোমশ হাতখানা দেখতে পেয়ে আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। ছপ করে রাম দা নামিয়ে আনল বৌটির স্বামী। এক কোপে ভূতের হাতখানা কেটে রেখে দিল দুভাগ করে।

হাতের ব্যথায় ভূতের সে কি চেঁচানি, তার চিল্লানিতে পুরো গাঁ জেগে উঠল। মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসল কী হয়েছে দেখার জন্য। ভূত বেটা কিন্তু তখন যন্ত্রণায় চেঁচায় আর ওদের শাসায়,- "দাঁড়া আজ জঙ্গলে যেয়ে দেখিস, লাকড়ি আনতে যেয়ে দেখিস, কাঁকড়া খুঁজতে যাবি না তো কোনদিন? তখন দেখবি মজা, ভূতের সাথে চালাকি, তোদের দুটোর ঘাড় মটকে যদি আমি খুন করে না ফেলি তবে আমার নামও মন্দ ভূত না এই বলে রাখলুম।" এসব বলতে বলতে ভূতটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

এদিকে ভূতটা যখন রাগে আর ব্যথায় কাতর হয়ে শাসাচ্ছিল তখন বৌটির স্বামী আরো বেশি রাগে ফুঁসতে থাকে। রাম দা নিয়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসে আরো এক কোপ দেবার জন্য। অমন চাকমা আর কাকে বলে? তবে সে কিন্তু বাইরে বেরুল না। শুধু আঁধার রাত বলেই রক্ষে পেল ভূতটা। যাহোক, রাতের আঁধারে ভূতের দাপট বেশি। আর আঁধারে ভূত দেখাই যায় না, নড়বে কার সাধ্যি? কোন দিকে দিয়ে এসে আবার ঘাড় মটকে দেয়।

(এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, চাকমারা বিশ্বাস করে, ভূতেরা রাম দা কে ভীষণ ভয় করে। যখন কারো হাতে রাম দা

থাকে তখন সে একাই একশো ভূতের কাছে। ভূত আর তার কাছে ঘেঁষেনা ভয়ে। কিন্তু খবরদার! হাতের রাম দায়ে একটুখানি আগুন ঠেকিয়েছ কি মরেছ! তখন আর কিচ্ছু ভয় পাবে না ভূতেরা। আগুন ছোঁয়ালে রাম দা নাকি মরে যায়। আর তা দিয়ে সারাদিন কোপালেও ভূতের কিচ্ছু হবে না তাতে। ভূতের একটা চুলও কাটবে না। ব্যপারটা মজার না? ভূত আগুনকে ভয় পায়, আবার রাম দাকেও ভয় পায়। কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে আসলে রাম দায়ের ক্ষমতা কমে যায়।)

অনেক্ষণ দাপাদাপি হম্বি তম্বি করে ভূতটা তো এক সময় গেল ফিরে। কিন্তু রাগটা ঠিকই মনের মধ্যে চেপে রাখল। এদিকে অমাগদের রাগও পরল না। সে শুধু অপেক্ষার প্রহর গুনল সকাল হবার। পরদিন সকাল হতে না হতেই বিশাল বড় এক থালে ভাত নিয়ে বসল। পুরো থালের খাবার খেয়ে শক্তি জুগিয়ে নিলো। এবার সে রাম দা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক ভূতটা যেখানে যেখানে যেতে শাসিয়েছে ঠিক সেখানে সেখানেই গেল। তখন আরো অনেক লোকও গেছে জঙ্গলে কাজ করতে। কেউ পেত্যাপাতা তুলছে, আবার কেউ বুনো কলাপাতা তুলছে, কেউ বা শুকনা কাঠ কুড়োচ্ছে এখানে সেখানে জট্লা বেঁধে, আবার কেউ আগাছা পরিষ্কার করছে জুমের জন্য। কিন্তু তাদের সবাই কি আর মানুষ? অনেক ভূতও মিশে আছে তাদের সাথে মানুষের রূপ নিয়ে। ওরা শুধু পাতা তোলার, কাঠ কুড়ানোর ভান করে আর সুযোগের সন্ধানে থাকে। একলা কাউকে পেলে অমনি তার ঘাড় মট্কে দেবে।

কিন্তু নাহ, মন্দ ভূতটার দেখা নেই ধারে কাছে। না পাতা তোলাদের দলে, না কাঠ কুড়োনোদের মাঝে। যেন একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে অমগদের ভয়ে। মানুষ হোক আর ভূতই হোক, এদের সবার দুটো করে হাত রয়েছে। দুটো করেই পা রয়েছে, তাই খুব সহজেই বোঝা গেল এদের মধ্যে মন্দ ভুত নেই। কারণ গতকাল মন্দ ভুতের একটা হাত খোয়া গেছে। কী করবে কিছুতেই ঠাওর করতে পারে না অমাগদ। শেষে সে তাদের ছাড়িয়ে আরো এগিয়ে গেল ছড়ার উজানে, যেখানে আরো অনেক লোক কাঁকড়া

ধরছে। কিন্তু সেখানেও যে দেখা নেই। তাই সে সামনে এগুতে লাগল। যেতে যেতে ছড়ার প্রায় সেই শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছায় সে।

এই জায়গাটা একটু নিরব। দু'ধারের বাঁশবন এপাশে ওপাশে হেলে পড়েছে। তাই দিনের বেলাও একটুখানি আঁধার মত হয়ে আছে। আশেপাশে তেমন মানুষজনও নেই। হঠাতই অমগদের চোখে পড়ল একটা লোক। লোকটার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, শরীরের রঙ কেমন তামাটে। লোকটা একাই সেখানে কাঁকড়া ধরছে। কাঁকড়ার গর্তে একখানা হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট ছড়ার প্রায় সবটা জুড়ে বসে আছে সে। নড়বার কোন নামগন্ধও নেই। অমগদ লোকটার কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে বলল- "এই, কে রে তুই? কী করছিস এখানে?"

লোকটা চোখ তুলে তাকাল তার দিকে। দুটো চোখই মরার মত সাদা ফ্যাকাসে। চেহারাটাও কেমন বিদঘুটে। দেখলেই গা ঘিনিয়ে আসে। লোকটা মিন্মিনে গলায় জবাব দিল, "দেখছিস্ না কাঁকড়া ধরছি?"

"তবে ও-হাতখানা বার কর্ দিহি গর্তের ভেতর থেকে।" অমগদ ধমকে দিয়ে বলল, "নয়তো এক কোঁপে কিন্তু গলা ফেলে দিব। এমনিতেই রাগে মাথা ফেটে যাচ্ছে।"

লোকটা কিন্তু হাত বের করল না। শুধু মাথা ঝাঁকাল আর বিড় বিড় করে বল্ল-"উঁহু। কাঁকড়াটা কামড়ে দিয়েছে, অনেকক্ষণ হাতটা বার করতে পারছি না কিছুতেই।"

অমগদ কিন্তু বোকা ছিল না। খুব সহজেই ভুতের চালাকি ধরে ফেলল। অমনি ঝট্ করে তার চুলের ঝুঁটি ধরে এক ঝটকায় তুল্ল তাকে। সাথে সাথে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসল লোকটার হাত। কিন্তু কোথায় হাত! কনুইয়ের উপর থেকে কাটা। হাতের হ ও নেই সেখানে। বুঝতে এক মুহূর্ত দেরি হলো না এটাই মন্দ ভূত। তখন আর দেরি কিসে? রাম দা'টা ঝপাং করে নামিয়ে আনলো মন্দ ভূতের ঘাড়ে। এক কোপে ভূতের মুন্ডুটা আলাদা হয়ে এল ধড়

থেকে। ভূতটা মুণ্ডুহীন দেহটা কতক্ষণ কাটা মুরগীর মতো লাফিয়ে শেষে একেবারে স্থির হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখার পর গিয়ে 'অমগদ' চাকমার রাগ থামে।

এর কিছুক্ষণ পরেই অমাগদ গাঁয়ে ফিরে এলো। এবার মন্দ ভূতকে মারার কথা বল্ল সবাইকে। সেদিন সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় মরা ভূত দেখতে আর কেউ যেতে পারল না। কিন্তু তার পরের দিন ভোর হতেই সবাই মজা করে দেখতে গেল ভূতের লাশটাকে। কিন্তু কোথায় লাশ? ভূতের নাম গন্ধও নেই আশেপাশে। যেখানে অমাগদ ভূত মেরেছে সে জায়গায় পড়ে আছে শুধু একটা মরা দাঁড় কাক! তবে কাকটার গলাটা দু'ভাগ করে কাটা। দেহটা এক দিকে মাথা আর এক দিকে।

তখন ভূতেরা সেই যে লুকিয়ে গেল ভয়ে, এখন শুধু আড়ালে আবডালে ভূতের শব্দ সাড়া মিলে। ভূতের ভয়টা আছে তবে কশ্চিৎ কারো ভূতের দেখা মিলে। আসলে ভূতেরাই আর আগের মত বার হয়না ভয়ে। কী জানি কোথায় কোন 'অমগদ' চাকমা আছে আর একটুখানি কসুর হলেই অমনি 'ঘ্যাচাং' করে কেটে দেবে মুন্ডু উড়িয়ে।

বাঘ ও শামুকের দৌড় প্রতিযোগিতা

"বাঘ ও শামুকের দৌড়" শুরুতেই লোক কথার নামটি পড়ে এই প্রতিযোগিতার বিষয়টি অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কারণ, প্রতিযোগিতা সাধারণত হয়ে থাকে প্রায় সমান সমান দুই শক্তিধরের মধ্যে। অর্থাৎ যাকে বলে কিনা সেয়ানে সেয়ানে। এছড়াও ঊনিশ আর বিশ এর মধ্যে প্রতিযোগিতা মানায়, ষোল আর বিশ এর মধ্যেও প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। তেরো আর বিশ এর মধ্যেও প্রতিযোগিতা কল্পনা করা যেতে পারে। তাই বলে এক আর বিশ এর প্রতিযোগিতা?

কিন্তু এখানে বলা হয়েছে এক অমিত শক্তির অধিকারী বাঘের সঙ্গে একরত্তি শামুকের প্রতিযোগিতার কথা। তাও যে সে প্রতিযোগিতা নয়— দৌঁড়ের প্রতিযোগিতা।

বিষয়টি নিয়ে ভাবলে অবিশ্বাস্যই মনে হয়। কিন্তু চাকমা আদিবাসীদের মধ্যে এরকম অবিশ্বাস্য এক অসম প্রতিযোগিতা নিয়ে একটি লোককথা প্রচলিত আছে। আর তাতে নাকি সত্যি সত্যি বাঘটির চরম পরাজয় হয়েছিল। কিভাবে বাঘের এই পরাজয় ঘটেছিল, তাহলে সে কথা বলছি, শুনুন।

মোটাসোটা একটি বাঘ শিকারের সন্ধানে হন্যে হয়ে বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় জল-তেষ্টায় বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন সে জলের সন্ধানে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নিচে নেমে যায়। নিচু জায়গায় গিয়ে সে একটি ছোট্ট পাহাড়ী ঝর্ণা খুঁজে পায়। ঝর্ণা দেখে তার জলের তৃষ্ণার পরিমাণ যেন দ্বিগুণ বেড়ে যায়। স্বচ্ছ জলরাশি গুলো কি সুন্দর ভাবে পাহাড়ের উপর থেকে ঢালু বেয়ে বেয়ে নিচে নেমে আসছে। নিজ ছন্দে চিকন লাইন ধরে আপন গতিতে বয়ে চলেছে। এ দৃশ্য দেখে বাঘের চোখ তখন জল পানের লোভে চিকচিক করে উঠে।

আর তখন সে আরাম করে হাঁটু গেড়ে বসে মুখ বাড়িয়ে ঝর্ণা থেকে মনের আনন্দে জল পান আরম্ভ করে। জলপানের সময় সে ঝর্ণার পরিষ্কার জলের নিচে পাথরের খাঁজে একটি ছোট্ট শামুককে দেখতে পায়।

অতি মন্থরগতির এই শামুকটির চলাফেরা দেখে বাঘ তাচ্ছিল্যসূচক একটুখানি মুচকি হাসি দেয়। শামুকটি বাঘের এই মুচকি হাসি দেখে বুঝতে পারে তার এই মন্থর গতির জন্য বাঘ তাকে ঠাট্টা করছে।

তখন শামুকটি রেগে মেগে প্রতিবাদ করে ওঠে। সে কঠিন গলায় বলে, "তুমি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছো কেন? আমার এই মন্থরগতি দেখে তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?"

শামুকের প্রশ্ন শুনে বাঘের হাসি যেন আরও বিস্তর লাভ করল। সে তার হাসির পরিমাণ যথারীতি ধরে রেখে হেসে হেসেই শামুককে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ। আসলে তোমার এই মন্থরগতি দেখে তোমার প্রতি আমার করুণা হয়। কারণ, আমি এতো দ্রুতগামী জীব হওয়া সত্বেও দৌঁড়ে শিকার ধরার সময় কখনো কখনো তা হাত থেকে ফসকে যায়। আর তুমি কি না অতি মন্থরগামী জীব। তুমি শিকার ধরবে কিভাবে?"

বাঘের কথা শুনে শামুকটি দ্বিগুণ রেগে গিয়ে বলল, "আমাকে অতি মন্থরগামী জীব ভেবে তুমি আমার প্রতি করুণা দেখাচ্ছ? আমি তোমার থেকে আকারে খুবই ছোট এবং ধীরে চলাফেরা করি বলে তুমি ভেবেছ আমি শিকার আহরণ করতে পারি কিনা? আসলে তুমি জানোই না, আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী। নিজের আকারে ছোট বলে কাউকে তুচ্ছাতাচ্ছিল্য করে কথা বলছ, নিজেকে নিয়ে খুব অহঙ্কার হচ্ছে তাই না? নিজের এই দ্রুতগতি নিয়ে তোমার গর্বে বুক ফুলে ফুলে উঠছে। তোমার এই অহেতুক অহঙ্কারের জন্যে বরং তোমার প্রতি আমার করুণা হয়।"

শামুকের কথা শুনে সাথে সাথে বাঘ বলল, "তাই নাকি! তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী?" এই কথাটি বলেই বাঘ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। তার সেই অহঙ্কারময় অট্টহাস্যে যেন গোটা বন বাদাড়কে কাঁপিয়ে দেয়।

শামুকটি তার আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, "হ্যাঁ সত্যিই তো, আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুতগামী। কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? হোক না তবে একবার দু'জনের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতা?" বাঘ প্রতিযোগিতার কথা শুনে আরো বেশি হাসতে লাগল। মুখে হাসি নিয়েই সে বলল, "তুমি কি ইয়ার্কি করছ, নাকি সত্যি সত্যি বলছ?" শামুক তার আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, সত্যি সত্যি বলছি। হোক একবার দৌড়ের প্রতিযোগিতা।"

বাঘ তখন বলল, "প্রতিযোগিতা হবে কিভাবে? তুমি থাক জলে আর আমি থাকি ডাঙায়। প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র কী হবে?" শামুক বলল, "তাতে চিন্তার কিছু নেই। তুমি ডাঙায় ঝর্ণার তীর বরাবর দৌঁড়াবে আর আমি দৌঁড়াব ঝর্ণার জলে। তুমি যথাসাধ্য দৌঁড়ে গিয়ে যেখানে থামবে সেখানে থেকে আমাকে ডাকবে। আর আমিও দৌঁড়ে গিয়ে জল থেকে তোমার ডাকে হৈ' শব্দে সাড়া দেব। তখন কে এগিয়ে রয়েছে তা বোঝা যাবে। এভাবে তিন ধাপে প্রতিযোগিতা হবে। যে এই তিন ধাপই জিতবে সে বনের সকল পশু পাখি এবং জলের প্রাণীদের সামনে যে পরাজিত হবে তার কান মলে দেবে। এটাই হবে বিজয়ীর পুরষ্কার আর পরাজিতের শাস্তি। কী তুমি রাজি তো?" কথাটি শুনে বাঘের বেশ পছন্দ হলো। নিজেকে আবার বনের ডাঙ্গায় থাকা সকল পশু পাখি এবং জলে বসবাস করা সকল প্রাণীদের সামনে শক্তিশালী হিসাবে প্রমাণ করা যাবে।

বাঘ সুনিশ্চিত যে বিজয়ীর মুকুট আজ তার মাথায় তাজ হয়েই উঠবে। এতে করে বনের সকল পশু পাখি তার কাছে নতজানু হবে। তাকে সব সময় সালাম দিয়ে কথা বলবে। তার সাথে আর কেউ পাল্লা দিয়ে চলতে চাইবে না। এই সব কিছু ভেবেই বাঘ আনন্দে উল্লাসিত প্রফুল্ল হয়ে প্রতিযোগিতার জন্য রাজি হয়ে যায়।

CamScanner

শামুকটি বাঘের রাজি হওয়া দেখে মুচকি হেসে বাঘকে বলল, "ঠিক আছে তাহলে এখন তুমি গিয়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নাও। কারণ এখন তো প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার পালা তাই না?" বাঘ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়িয়ে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি নিতে চলে যায় খুশি মনে। আজ তার আনন্দ আর পেটে ধরছে না। সব আনন্দই যেন বাইরে বের হয়ে আসতে চাইছে।

বাঘ চলে যেতেই শামুকটি তখন নাবালাং(দাড়কিনা) মাছটিকে ডেকে চুপি চুপি বলল, "তুমি এক্ষুনি ঝর্ণার ভাটি বরাবর দৌড়ে গিয়ে সব শামুকদের বলে এসো যে, বাঘ ঝর্ণার পাড়ে যেখানে গিয়ে হাঁক দেবে, তা থেকে ভাটির দিকে দশ বারো হাত দূরের কোন একটি শামুক যেন 'হৈ' শব্দে সাড়া দেয়। যাও, এক্ষুনি কথাটি সবাইকে বলে এসো।" শামুকের আদেশ পাওয়া মাত্রই নাবালাং মাছটি ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়ে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঝর্ণার ভাটির দিকের সব শামুকদের কথাটি জানিয়ে দিয়ে ফিরে এলো। ফিরে এসে নাবালাং মাছটি তার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার খবর জানাল শামুককে।

এবার প্রতিযোগিতার পালা। আসলে শামুকের কথা শুনে বাঘ প্রথমে এই প্রতিযোগিতার ব্যাপারটি তেমন গুরুত্বই দেয়নি। সে শামুকের সঙ্গে একটু মজা করার জন্য রাজি হয়েছিল। পরে যখন শামুকটি বনের সকল প্রাণীর সামনে কান মলে দেওয়ার কথা বলল তখন তার নিজের দ্রুতিগতি এবং নিজের উপর আত্মবিশ্বাসের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে সেখানে জায়গা করে নিল অহঙ্কার। সে নিজের দ্রুতগতির অহঙ্কারে এতোটাই ডুবে গিয়েছিল যে সে প্রতিযোগিতার জন্য রাজি হয়ে যায়।

ফলে যথাসময়ে প্রতিযোগিতা শুরু হলে বাঘ দৌঁড় না দিয়ে একটু জোরে জোরে পা ফেলে বিশ-ত্রিশ হাত এগিয়ে গেল এবং কথা মতো থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরে হাঁক দিল শামুককে। তৎক্ষণাৎ ভাটির দিকের দশ-বারো হাত দূর থেকে একটি শামুক হৈ' শব্দে বাঘের ডাকের প্রত্যুত্তর দিল। বাঘটি রীতিমতো অবাক, "সত্যিই কি শামুকটি এতো দৌঁড়তে পারে! তার চলাফেরা দেখে তো বিশ্বাস হয়

না অথচ শামুকটি সত্যি সত্যি তার তুলনায় দশবারো হাত এগিয়ে রয়েছে।"

এবার বাঘটি ভাবল, "শামুকটিকে হারিয়ে দিতে আমাকে রীতিমতো দৌঁড়াতে হবে দেখছি।" যে ভাবনা সে কাজ, বাঘ লেজ তুলে বেশ জোরে দিল সেই এক ছুট। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত দূরে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ালো। আর আগের মতোই পেছন ফিরে হাঁক দিল। বাঘের হাঁক ডাক শুনে এবারও সামনের দশ বারো হাত দূর থেকে অন্য একটি শামুক হৈ' শব্দে সাড়া দিল। সামনের দিক থেকে শামুকের সাড়া পেয়ে বাঘ দারুণভাবে হতভম্ব হলো। সে ভাবল - তা কী করে সম্ভব?

"শামুকটি কি সত্যি এতো দ্রুত দৌঁড়তে পারে! আজ তো দেখছি শেষমেষ শামুকের হাতে কানমলা খেতেই হবে। সামান্য একটা শামুকের কাছে তাকে কানমলা খেতে হবে?" আর এই কানমলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে দৌড় দিয়ে সে শামুকটিকে হারিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মনে মনে। সে একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করল, এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লেজখানি উঁচু করে দিল তার শেষ দৌড়টি।

এবার প্রায় একশো হাত দূরে দৌড়ে গিয়ে সে থামলো এবং সে মনে মনে ভাবতে লাগল শামুকটি এবার অবশ্যই পেছনে পড়ে রয়েছে। কারণ সে যে গতিতে দৌঁড়িয়েছে তাতে করে শামুক পেছনেই পড়ে থাকার কথা। সেই ভাবনা থেকেই বাঘ এবারও হাঁক দিল। আগের মতোই প্রায় দশ বারো হাত দূর থেকে অপর একটি শামুক হৈ' শব্দে সাড়া দিল। শামুকের "হৈ" শব্দ সাড়া পেয়ে বাঘটি এবার সত্যিই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

তার কাছে সব কিছু কেমন যেন অবিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল বার বার। সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যে সামান্য একটা মন্থরগতির শামুক প্রতিবারই তার থেকে দশ বারো হাত দূর থেকেই তার "হাঁক" ডাকে সাঁড়া দিয়ে "হৈ" শব্দ করছে। এটা কিভাবে সম্ভব? এমন সব প্রশ্নে বাঘ তখন চিন্তাহীনতায় ভুগতে

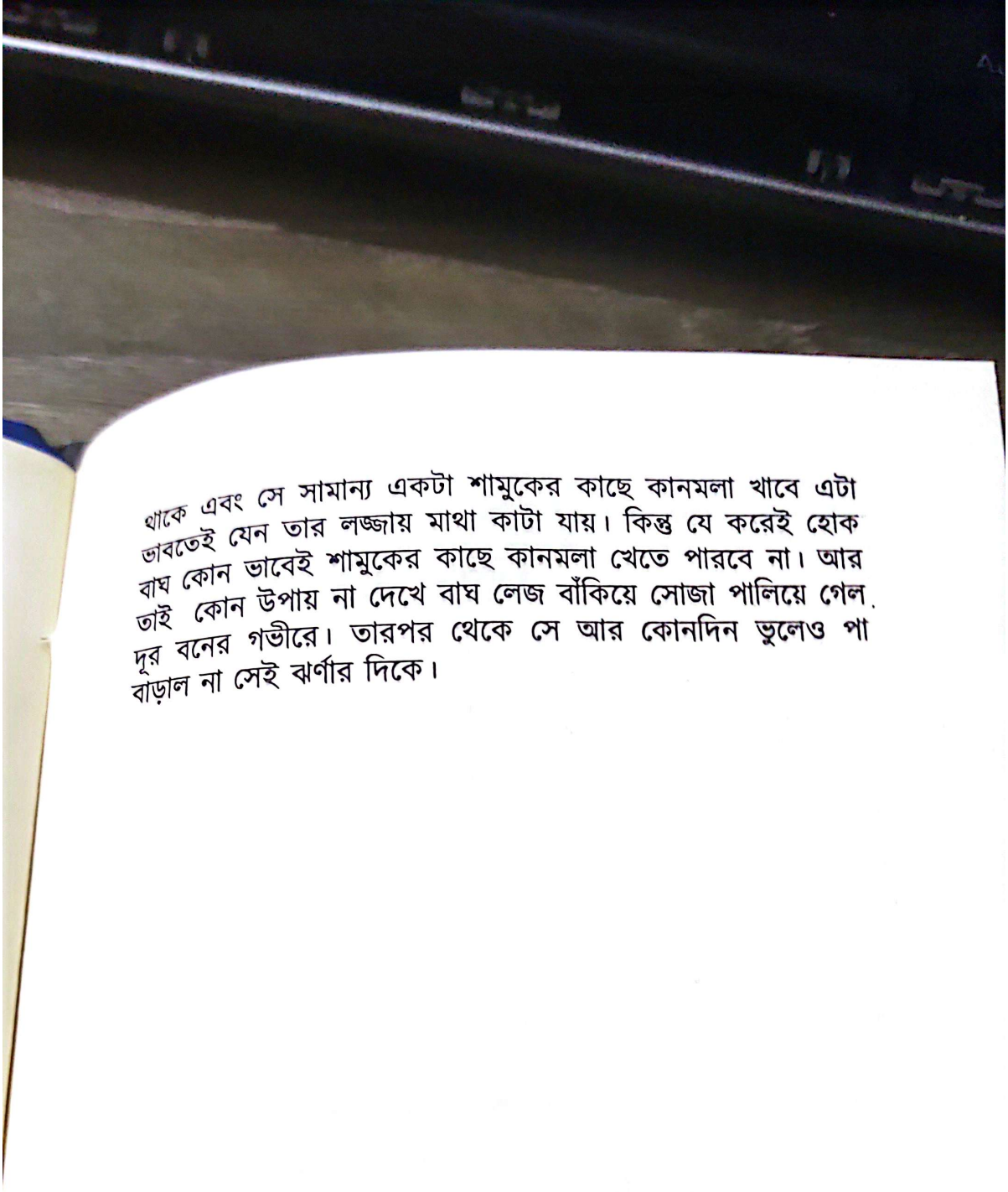

থাকে এবং সে সামান্য একটা শামুকের কাছে কানমলা খাবে এটা ভাবতেই যেন তার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কিন্তু যে করেই হোক বাঘ কোন ভাবেই শামুকের কাছে কানমলা খেতে পারবে না। আর তাই কোন উপায় না দেখে বাঘ লেজ বাঁকিয়ে সোজা পালিয়ে গেল দূর বনের গভীরে। তারপর থেকে সে আর কোনদিন ভুলেও পা বাড়াল না সেই ঝর্ণার দিকে।

CamScanner

ফিঙে, চড়ুই ও কাক

এক গভীর জঙ্গলে বাস করত ফিঙে, কাক আর চড়ুই পাখি। পুরো বন জুড়েই ছিল তাদের রাজত্ব। এই বনে অন্যান্য পাখি তেমন ছিল না। কিছু পাখি মাঝে মাঝে আসত। তবে স্থায়ী ভাবে বনে থাকত না। কিছুদিন থাকত, ঘুরে ঘুরে দেখত, তারপর আবার চলে যেতে। এভাবেই চলছিল এই বনের পাখিদের বসবাস।

এখন এই তিন জাতীয় পাখিরা তো এমনি এমনি থাকতে পারে না। তাদের এক সাথে থাকতে হলে আইন শৃঙ্খলা লাগে। আর আইন শৃঙ্খলা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য লাগে রাজা। তো একদিন সকলের সম্মতিতেই ফিঙে হয়ে গেল তাদের রাজা। এরপর কিছু দিন সব কিছু ঠিকভাবেই চলল। কিন্তু হঠাৎই কাকেরা ফিঙেকে তাদের রাজা হিসেবে মেনে নিতে অসম্মতি জানাতে শুরু করল। এমনকি কথাও পর্যন্ত শুনত না। কোন আইন শৃঙ্খলা মানত না।

তার কারণ ফিঙে রাজা কাকদের চেয়ে চড়ুই পাখিদেরকে বেশি ভালোবাসতো, আদর করত, স্নেহ করত। যেকোন কিছুতেই চড়ুই পাখিকে অগ্রাধিকার দিত। এতে করে হিংসায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল কাকের দল। তারা রাগ করে চড়ুই পাখিদের ডিম ভেঙে দিতে লাগল। ছানা ফেলে দিল বাসা থাকে। এ খবর খুব দ্রুতই পৌঁছে গেল রাজা ফিঙের কাছে। রাজা কিন্তু কিছুতেই সহ্য করতে পারল না এসব কিছু। তাই কাকদের ডেকে পাঠাল। কাক আসতেই তাদের উপর চড়াও হলো।

এতে ক্ষেপে গেল কাকের দলও। আর কে বা কার অধীনে থাকতে চাইবে। সবাই স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়। তাই তারা প্রতিরোধের ঝড় মনের মধ্যে গেঁথে রাখল। একদিন সে ঝড় বিস্ফোরণ হয়ে শুরু হলো দু'পক্ষের দ্বন্দ্ব এবং পরে রীতিমত যুদ্ধ। সেটা যেমন তেমন যুদ্ধ নয়, একেবারে পাহাড় পর্বত, গিরি শৃঙ্গ

কেঁপে যাওয়ার মত যুদ্ধ। কখনো কাকের দল এগিয়ে আবার কখনো ফিঙের দল এগিয়ে। এভাবেই যুদ্ধ হতে থাকে। এতো বেশ কিছু কাক আর ফিঙে প্রাণও হারায়। কিন্তু তাদের এই যুদ্ধ আর থামে না।

কাক আর ফিঙের এই ভয়ানক যুদ্ধ দেখে চড়ুই পাখিরা বিরাট চিন্তায় পরে গেল। কী করবে তারা? কী বা তাদের করণীয়? কাদের পক্ষ নিলে চড়ুইদের লাভ বেশি? যার কারণে তারা একদিন মিটিং এ বসল। তিন দিন তিন রাত সে মিটিং চলল। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিলো কাকদের পক্ষ নেবে। তার কারণ ফিঙেদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই রাজার অধীনতা থেকে তারাও রক্ষা পেয়ে যাবে। অথচ চড়ুইয়ের জন্যেই দুই পক্ষের যুদ্ধ।

যেমন ভাবনা তেমন কাজ। চড়ুইয়ের দলও যুদ্ধে নেমে গেল। এখন যুদ্ধটা আগের চেয়ে আরো ভয়ানক রূপ ধারণ করল। কাকের দল ভারি হয়ে গেল। কিন্তু ফিঙেরা ছিল রণ-কৌশলে অনেক বেশি এগিয়ে। তবে দুর্ভাগ্যবশত ফিঙেরা যুদ্ধে হেরে গেল।

যুদ্ধে যখন হেরে গেল, রাজা তখন চিন্তা করতে লাগল, "বন ছেড়ে তো আমাদের চলেই যেতে হবে, তবে যাবার আগে একটু চড়ুই পাখিদেরকে উপকার করে যাই।" তাই যুদ্ধ থামিয়ে রাজা কাকদেরকে বলল, "বন্ধুগণ, আমরা হার মেনে নিচ্ছি। তোমারই বিজয়ী। এবার যুদ্ধ থামাও।" এবার যুদ্ধ থেমে গেল। তখন ফিঙে আবার বলল, "আমরা তো এই বনে থাকতে পারব না। তবে যাবার বেলায় তোমাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, জানিনা তা রক্ষা করবে কি না, তবুও অনুরোধটা করছি।"

ফিঙের কথা শুনে কাকের দল বলে উঠল, "ঠিক আছে বলে দেখুন। আমরা অবশ্যই রাখার চেষ্টা করব।" তাদের সাড়া পেয়ে রাজা একটু স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপ রাজা বলল, "চড়ুই পাখিরা তোমাদের থেকে ছোট, অসহায় তাই তাদেরকে যদি তোমরা স্নেহ যত্ন করো। আগের মতো তাদের ক্ষতি করো না। তাদের ডিম নষ্ট করো না, বাচ্চা মেরো না। তাহলে আমি খুবই খুশি হব।"

অপরদিকে কাকেরাও চিন্তা করে দেখল, "যাবার বেলায় রাজা যখন অনুরোধ করছে, তাই এই অনুরোধ ফেলা ঠিক হবে না।" তাই কাকও রাজি হয়ে গেল, "আচ্ছা আমরা আপনার কথা মেনে চলার চেষ্টা করব।" এবার কাকদের যখন কথা পেল তখন রাজা আর দেরি না করে সহসা তার দলবল নিয়ে এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গেল। ফিঙেরা যখন চলে গেল, তাদের কি যে আনন্দ! সাথে চড়ুইয়ের দলও অনেক আনন্দ করল। কেননা এখন তারা স্বাধীন। কারো অধীনে থেকে কোন কিছু শোনার দরকার নেই।

কিন্তু দিন কয়েক পেরিয়ে যেতে না যেতেই কাকেরা আবার পুরানো স্বভাব বের করে আনল। চড়ুই পাখিদের উপর আবার আক্রমণ শুরু করল। সবসময় ঝগড়া করত চড়ুইদের সাথে। কখনো কখনো ডিম ভেঙে দিচ্ছে আবার কখনো বাচ্চা মেরে ফেলছে। এদিকে ঝগড়া হলে চড়ুই দোষী হোক আর না হোক, তাকে মেরে ফেলতে লাগল। কিন্তু ছোট জাত, তারা কী করবে? ঝগড়া করে তাদের সাথে পারছে না। তবুও বাঁচার জন্য প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। কাকদের থেকে রেহাই পাবার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর মনে মনে ভাবছে ফিঙে রাজা কতই না ভালো ছিল।

সে জন্য চাকমাদের প্রবাদ হিসেবে আছে *"চড়ুইদের পালানো, আর কাকদের তাড়ানো।"*

CamScanner

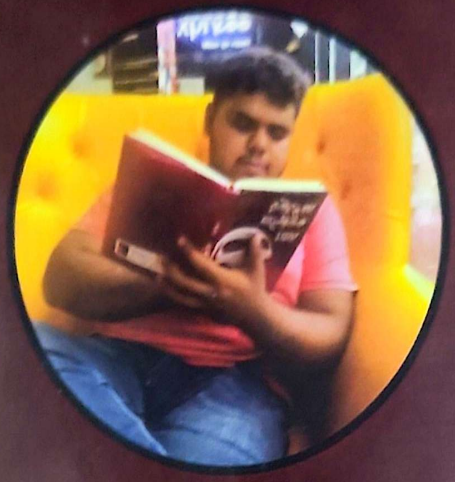

সারোয়ার হাসানের জন্ম ২রা ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায়। শৈশব কৈশোর পার করেছেন এখানেই। মা বাবার বড় সন্তান তিনি। নবাব আসকারী আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং আমিরজান কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে এখন সরকারি তোলারাম কলেজে অধ্যয়নরত আছেন। ফ্যান্টাসি দিয়ে লেখকের লেখক জীবনের সূত্রপাত হলেও প্রায় সব জনরাতেই লিখতে চান তিনি। তাঁর বেশ কিছু ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে যৌথগ্রন্থে । এছাড়াও বইটই এপসে "বিষণ্ণ কবি" এবং "পঞ্চত্বপ্রাপ্তির সন্ধানে" শিরোনামে দুটি ই-বুক প্রকাশিত হয়েছে। চাকমা মিথলজি লেখকের প্রথম মলাটবদ্ধ বই হলেও এখন তিনি কাজ করে যাচ্ছেন গারো মিথলজি এবং "মৃত্যুপুঁথি" শিরোনামে একটা এপিক ফ্যান্টাসির ট্রিলজি নিয়ে।